শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মায়ের মুখের কথা

‘যশোদা গর্ভসম্ভবা’

স্বামী নিত্যরূপানন্দ

মানুষের মুখের কথা আর ঈশ্বর বা ঈশ্বরীর মুখের কথায় আসমান-জমিন ফারাক থাকে। যুগ যুগ ধরে মানুষ, ঋষি-মুনিদের বচনের বা বেদ-উপনিষদ-গীতা-ভাগবত-চণ্ডী ইত্যাদি গ্রন্থের আলোচনা-সমালোচনা-ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে—তার ফলস্বরূপ, হাজার হাজার নতুন পুস্তকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু ঈশ্বরের শ্রীমুখের কথার মাধুর্য ও মহিমা আবহমান কাল ধরে একইরকম শক্তিশালী, অনবদ্য, প্রিয় ও প্রামাণ্যরূপে মানুষের কাছে গৃহীত হয়ে আসছে। মানুষের চিন্তা-কল্পনা কক্ষনো ভগবানের স্বরূপের, মহিমার পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারে না। শিবমহিম্ন স্তোত্রে তাই পুষ্পদন্ত তাঁর বিরচিত বিখ্যাত স্তবে ভগবানের অপার মহিমার ইতি করতে ব্যর্থ হয়ে বলেছেন—

“অসিতগিরি সমং স্যাৎ
কজ্জ্বলং সিন্ধুপাত্রে সুরতরুবর-শাখা লেখনি পত্রমুর্বি
লিখতি যদি গৃহিত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি।।”

লেখক পুষ্পদন্ত বলছেন—সমুদ্রের পর্বতপ্রমাণ কালি মিশিয়ে যদি পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষশাখাকে কলম বানিয়ে মহাদেবের মহিমা স্বয়ং মা সরস্বতী নিজেও যদি বর্ণনা করেন—তথাপি তাঁর গুণের ইতি করা যাবে না। এই বিষয়ে একটি সুন্দর বাংলা গানও আছে, আমরা দুর্গাপূজার সময় বারাকপুর বিবেকানন্দ মঠে গাই—

“হয়ত আমি কইতে কথা
কইব মুখে যা আসে তা
সে তো আমার কথার কথা
অমর হয়ে রইবে ভবে।।”

শ্রীশ্রীগীতা গ্রন্থের দিকে যদি তাকাই দেখতে পাব ৭০০ শ্লোকের মধ্যে বেশিরভাগটাই ‘শ্রীভগবানুবাচঃ’ এবং এই ‘শ্রীভগবানুবাচঃ’ বাণীগুলিই আমাদের কাছে মন্ত্রের মতো আসল ও মূল্যবান। শ্রীশ্রীগীতাতে কৃষ্ণসখা অর্জুন অনেক প্রশ্ন করলেও—অর্জুনের প্রশ্নগুলিকে শ্রীশ্রীগীতায় উক্ত মন্ত্রের মর্যাদা দেওয়া হয় না। একমাত্র ‘শ্রীভগবানুবাচঃ’ যে শ্লোকগুলি শ্রীশ্রীগীতা গ্রন্থে আছে—সেগুলিই মন্ত্র। আবার যদি শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব সমগ্র চণ্ডীতে ৭০০ শ্লোক থাকলেও শ্রীশ্রীমা জগদম্বার কথাগুলি ‘শ্রীদেব্যুবাচঃ’—এই শিরোনামের নীচে দেওয়া আছে। ‘শ্রীদেব্যুবাচঃ’ কথাগুলির জোর, আধ্যাত্মিক শক্তি এবং সৌন্দর্য সবচেয়ে বেশি। শ্রীশ্রীচণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ের ৪২ নং শ্লোকে শ্রীশ্রীমা জগদম্বা নিজমুখে বলেছেন—**“নন্দগোপ কুলে জাতা যশোদা গর্ভসম্ভবা।”** সেই যশোদার গর্ভে তিনিও আবির্ভূত হবেন। আজও যদি কোনো নারী যশোদার অলংকারে ভূষিত হতে পারেন তাহলে তিনি জগন্মাতাকেও কন্যারূপে পেয়ে “আপনি মাতিয়ে—জগৎ মাতাতে” পারেন। ‘যশোদা’ একটি ফ্রিজের মতো শক্তিশালী—যা তরলকে কঠিনে রূপান্তরিত করতে পারে। শ্রীশ্রীঠাকুর বহুবার সাকার-নিরাকারের উপমা দিতে গিয়ে বলেছেন—**“অনন্ত জলরাশি যেন নিরাকারের উপমা, তার মধ্যে কোথাও কোথাও জল ভক্তি হিমে সাকার, বরফ হয়।”** ভক্তি হিমে বরফ করার শক্তি যশোদার আছে—তিনিই পারেন নিরাকারকে সাকার করতে। তিনিই পারেন অসীমকে আমাদের এই ত্রিতাপ-তাড়িত পৃথিবীতে আবাহন করে শান্তি-সৌহার্দ্য-প্রীতির সুষমায় ভরে দিতে। পাঠক হয়তো ভাবছেন এই বাক্যগুলি কবি-কল্পনায় ঠিক আছে কিন্তু বাস্তবায়িত করা অসম্ভব। কল্পনা কিন্তু বাস্তবের জন্ম দেয়। **স্বামীজি বারবার বলেছেন, যে গভীর কল্পনা করতে পারে তার কাছে সত্য আত্মপ্রকাশ করেন।** যেমন কুমুরে পোকার প্রজাপতি হবার

● মা যশোদার কোলে বালগোপাল।

কল্পনা তাকে প্রজাপতিতে রূপান্তরিত করে। যশোদার গভীর কল্পনা তাঁর গর্ভে স্বয়ং জগদীশ্বরীকে টেনে আনে—শুধু দ্বাপর যুগে নয়—যুগ যুগ ধরে।

সাম্প্রতিককালে উনবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে শ্যামাসুন্দরীর মধ্যে যশোদার ভাব জেগে উঠেছিল বলেই তাঁর গর্ভে প্রবেশ করেছিলেন জগদম্বা স্বয়ং শিহড়ের এক পুকুরের ধারে বিল্ববৃক্ষমূলে। পাঠক একটু ভাবুন এই বিল্ববৃক্ষমূলে কার বোধন হয়? তিনি আপনার কে? তিনি আমার কে? তিনি এই জগতের কে? তিনিই হলেন—

"ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিঃ অনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া
সম্মোহিতং দেবী সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।।"

দেবী ভাগবতে তাঁরই মহিমা বিস্তার করে লেখা আছে—কিন্তু লিখেও শেষ করা যায়নি। সেখানে মা মেনকার গলা জড়িয়ে রক্তবস্ত্র পরিহিতা নানা অলংকারভূষিতা পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা বলেছিলেন—"মা, আপনার ঘরে আমি এলাম।" আবার এতদিন পরে তিনি এলেন—শ্যামাসুন্দরীর গলা জড়িয়ে ধরে—সেই একই পোশাকে। তিনি আসতে চান—আমাদের সঙ্গে থাকতে

● জগজ্জননী মা দুর্গা।

চান কিন্তু আমরা প্রারব্ধবশত যশোদা হতে পারি না, আমরা আমাদের দুর্ভাগ্যবশত শ্যামাসুন্দরী হতে পারি না। তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছেন—কে হাত বাড়িয়ে তাঁকে আদর করে আনবে। কবির ভাষায় বলতে গেলে—

"দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে—
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে।।
বাতাস বহে মরি মরি, আর বেঁধে রেখো না তরী—
এসো এসো পার হয়ে মোর হৃদয় মাঝারে।।
তোমার সাথে গানের খেলা দূরের খেলা যে,
বেদনাতে বাঁশি বাজায় সকল বেলা যে।
কবে নিয়ে আমার বাঁশি বাজাবে গো আপনি আসি
আনন্দময় নীরব রাতের নিবিড় আঁধারে।।"

পাঠকদের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগে মা যশোদা কে? তাঁর পূর্ব পরিচয় কী? মা যশোদা জগদম্বার মাতা—যশোদার গর্ভে মা দুর্গা স্বয়ং জন্মলাভ করেন, যাঁকে দুরাচারী মথুরার রাজা কংস, দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান মনে করে মারতে গেলে, বালিকা আকাশের উপরে উঠে যান এবং অষ্টভুজা মূর্তি ধারণ করে কংসকে সতর্ক করে বলেন—"ওরে কংস, তুই অনেক পাপ করেছিস। তোর ধ্বংসের দিন আসন্ন। তোকে যে মারবে সে জন্মেছে এবং গোকুলে বড় হচ্ছে।" তিনি অষ্টভুজা দুর্গা রূপে কংসকে সাবধান বাণী শুনিয়েছিলেন।

আবার যশোদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পালিকা মাতা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর সন্তান কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে লালন-পালন করে বড় করেন মা যশোদা এবং পিতা নন্দ। যশোদার জীবনটা সত্যিই বৈচিত্র্যময়। তিনি নিজে জানতেন না যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গর্ভজাত সন্তান নন—তাই শ্রীকৃষ্ণকে নিজ পুত্রের মতোই স্নেহ-মায়া-মমতা দিয়ে লালন-পালন করেন। আমরা শ্রীকৃষ্ণের মা বলতে যশোদাকেই সাধারণত বলি—যদিও শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভজাত সন্তান। অনেকে প্রশ্ন করেন—দেবকীর গর্ভে ভগবানের জন্ম হলেও, তাঁকে এত যন্ত্রণা পেতে হয়েছিল কেন? একে তো কংসের অন্ধকার কারাগারে শিকলে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় প্রায় চৌদ্দ বছর দেবকী ও বসুদেব ছিলেন। তার উপরে অত্যাচারী কংস, দেবকীর ফুলের মতো নিষ্পাপ ছয়টি সন্তানকে পরপর হত্যা করে। মাঝে একজনকে ভগবান যোগমায়ার সাহায্যে বসুদেবের আর এক স্ত্রী গোকুল নিবাসী রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত করেন, যিনি পরবর্তীকালে বলরাম বলে পরিচিত হন এবং অষ্টম গর্ভজাত পুত্রের বদলে কন্যাকে কংস বধ করতে গেলে সেই দৈবী কন্যা নানা অলংকার ভূষিতা অষ্টভুজা দুর্গার রূপ ধারণ করে দুরাচারী কংসের ধ্বংসের সূচনা করেন। জানা যায় যে, দেবকী আগের জন্মে অর্থাৎ ত্রেতাতে কৈকেয়ী ছিলেন—তিনি অকারণে নিজের পুত্র ভরতের রাজা হবার স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য দেবতুল্য অগ্রজ কৌশল্যার পুত্র রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠান, ১৪ বছরের জন্য, সঙ্গে সীতা এবং লক্ষ্মণকেও বনবাসের কঠোর সমস্যাসঙ্কুল জীবন এবং প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এই দীর্ঘ ১৪ বছর শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসের কষ্ট দেওয়ার মূল কারণ কৈকেয়ী হওয়ায়—তাঁকে কর্মফল ভোগার জন্য দ্বাপরযুগে দেবকীরূপে জন্মগ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণের মাতা হয়ে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয়, কংসের কারাগারে চৌদ্দ বছর বন্দি ছিলেন তিনি এবং গর্ভের সদ্যোজাত অনেকগুলি সন্তানকে হারিয়ে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

অন্যদিকে শ্রীরামচন্দ্র চৌদ্দ বছর বনবাসে থাকাকালীন কৌশল্যা প্রচণ্ড মানসিক কষ্ট ভোগ করেন। তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্রের জীবনে অবাঞ্ছিত বিপদকে তিনি অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেননি। তাই শ্রীরামের বনবাসে থাকাকালীন প্রতিটি দিন তিনি শারীরিক ও মানসিক কষ্টে কাটিয়েছিলেন। প্রকৃতির নিয়মই আছে দুঃখের পর আসে সুখ। "চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানিচ দুঃখানিচ।" কৌশল্যা দ্বাপর যুগে যশোদা হয়ে গোকুলে জন্মলাভ করেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গর্ভধারিণী মা না হয়েও প্রায় চৌদ্দ বছর দীর্ঘকাল মাধুর্যময় শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা প্রাণভরে উপভোগ করেন—তাঁর ত্রেতাতে যে কষ্ট চৌদ্দ বছর হয়েছিল—এটাই তার পুরস্কার। এই হল যশোদার প্রকৃত পরিচয়। যশোদা নামের মাহাত্ম্য হল যিনি জাগতিক যশ ত্যাগ করেছেন বা দান করেছেন। আমরা সাধারণ মানুষ জগদম্বাকে সর্বদা প্রার্থনা করি—"রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি।।" মা যশোদা জাগতিক যশ চান না—তাঁর একমাত্র যশ হল শ্রীভগবানের বা শ্রীভগবতীর মা বলে পরিচিত হওয়া। এর জন্যই তিনি যশো-দা অর্থাৎ যিনি জাগতিক যশের বাসনা ত্যাগ করেছেন।

আমরা মহামায়া অষ্টভুজার আবির্ভাবের কথায় ফিরে আসি। যেদিন জন্মাষ্টমী তিথির তিমির রাত্রি—সেই ঝঞ্ঝা ও বিপদসঙ্কুল তিমির রাত্রে—শ্রীভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণ এবং জগন্মাতা প্রায় একই দিনে রাত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী তিথি দুই দিক থেকেই পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ। মহামায়া স্বয়ং

জন্মাষ্টমী তিথিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলেই—বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীশ্রীদুর্গা ঠাকুরের প্রতিমার কাঠামো পুণ্য জন্মাষ্টমী তিথিতে পূজা করা হয়। জন্মাষ্টমীতে আবির্ভূতা অষ্টভুজা দেবীই হলেন আমাদের শারদীয়া উৎসবের প্রাণপ্রতিমা মা দুর্গা। তিনিই আদ্যাশক্তি মহামায়া আবার তিনিই—যশোদার গর্ভে জন্মেছিলেন—'যশোদা গর্ভসম্ভবা'—এ বাণী তাঁর নিজ মুখের।

বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে শক্তির বিনাশ নেই। শক্তি রূপান্তরিত হন মাত্র। যেমন সূর্যের তাপশক্তি রূপান্তরিত হয় তড়িৎশক্তিতে, গতিশক্তিতে, প্রাণশক্তিতে ইত্যাদি বিভিন্নভাবে স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী—কিন্তু তিনি অবিনাশী। পাঠক জানলে অবাক হবেন যে—শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধে মহামায়ার আবির্ভাব কাহিনি ও তাঁর লীলামাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে মহাজ্ঞানী শুকদেব ওই বিজ্ঞানের কথাগুলিই সংস্কৃত শ্লোকের মোড়কে বলেছেন। তিনি বলছেন—

"অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপস্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দাপত্ন্যাং ভবিষ্যসি।।৯
অর্চ্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্ব্বকামবরেশ্বরীম্।
ধুপোপহারবলিভিঃ সর্ব্বকামবরপ্রদাম।।১০
নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ।।১১
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যাম্বকেতি চ।।১২"

বঙ্গার্থ হল : হে কল্যাণি, অতঃপর আমি পূর্ণরূপে দেবকীর পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব এবং তুমিও নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে আবির্ভূতা হইবে। সর্ববিধ কামনা ও বরের অধীশ্বরী এবং সর্বাভীষ্টপ্রদায়িনী তোমাকে মনুষ্যগণ ধূপ উপহারাদির দ্বারা পূজা করিবে। পৃথিবীতে মনুষ্যগণ তোমার আবির্ভাবের অনেক বিশেষ স্থানে যাবে এবং দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা ও অম্বিকা প্রভৃতি নামে পূজা করিবে।

উপরোক্ত শ্লোকগুলিই প্রমাণ করে তিনিই পৃথিবীর বিখ্যাত একান্নটি শক্তিপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; যেখানে আজও তিনি স্বমহিমায় বিরাজ করছেন এবং অগণিত ভক্ত সন্তানের পূজা গ্রহণ করে তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ করে চলেছেন। তাই তিনি নিত্য বিরাজিতা, তিনি শক্তিস্বরূপিণী, তাঁর বিনাশ নেই। নিত্য এই জগন্মাতাকে আমরা শরৎকালের অপরূপ প্রাকৃতিক শোভায় মোহিত, পুলকিত হয়ে আহ্বান করি, বোধন করি—আর তিনি সর্বদা আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে দশভুজা দুর্গারূপে দশদিক আলো করে প্রতি বছর আগমন করেন। এই আমাদের মা দুর্গা, এই আমাদের দুর্গাপূজার মাহাত্ম্য। আমরা করজোড়ে তাঁকে প্রার্থনা করি :

"প্রসীদ জগতাং মাতঃ
প্রসীদ ভক্তবৎসলে—
প্রসাদং করণ মে দেবি
দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে।।"

বারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনে প্রতিষ্ঠার ঊষালগ্ন থেকে যে শারদীয়া দুর্গাপূজার ব্যবস্থা হয়—সেটি অনবদ্য এবং প্রতিষ্ঠাতা স্বামী নিত্যানন্দজি সেইসময় মন-প্রাণ উজাড় করে ভজন-ভোগ ও ভক্তির দ্বারা জগন্মাতার যে উপাসনা করতেন—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। তাঁর আবেগ শুধুমাত্র প্রার্থনা-প্রসাদেই আবদ্ধ থাকেনি—সেই আবেগ প্লাবিত হয়ে তাঁর লেখনীতে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীপাদপদ্মে গীত পুষ্পাঞ্জলিরূপেও আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর লেখা সেই ভক্তিপূর্ণ একটি গান দিয়ে আমরা শ্রীশ্রীমা দুর্গার শ্রীচরণে শারদ-অর্ঘ্য প্রদান করলাম :

আয় না রে ভাই মিলে সবাই মাকে প্রণাম করি।
মায়ের পায় ভক্তি-মুক্তি মা যে শুভঙ্করী।।
একই সাথে একই সুরে, একই প্রাণে একই গানে
একটি কথা বলব সবাই মায়ের পায়ে ধরি—
"বিদ্যাবন্তং যশোবন্তং লক্ষ্মীবন্তং মাং কুরু
বিবেক বৈরাগ্য দেহি, দেহি সদ্‌গুরু।
দেহি দেবি পরম্ সুখং দেহি পরম্ ধন,
দেহি পরম্ জ্ঞানং মাতঃ দেহি শ্রীচরণ।"
আর তো কিছুই নাই মা মোদের তোমায় বলিবার,
একটি কথাই বলব শুধু নমি বারংবার—
এই জগতে এই জীবনে দেখব তোমায় এই নয়নে,
মহানন্দে নাচব সবাই তোমার আঁচল ধরি।।

দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণের ফল

সুমন ভট্টাচার্য

বৈদিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষে শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল। শ্রীশ্রীচণ্ডী তথা দেবীমাহাত্ম্য হল বেদমূলা। এর প্রথম চরিত্র ঋগ্বেদ স্বরূপা, মধ্যম চরিত্র যজুর্বেদ স্বরূপা ও উত্তম চরিত্র সামবেদ স্বরূপা। চরিত্রত্রয়ের ছন্দ যথাক্রমে গায়ত্রী, উষ্ণিক ও অনুষ্টুপ। চণ্ডী পরমাত্মময়ী। বেদমাতাই চণ্ডীরূপে প্রকটিতা। আবার বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মেও শক্তিবাদ দৃষ্ট হয়। মহাভারতে শক্তিবাদের তথ্য দেবী উপাসনার বিষয় উল্লিখিত আছে। ভীষ্মপর্বের ২৩শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়লাভের পূর্বে দুর্গাদেবীকে প্রণাম ও প্রার্থনা করতে উপদেশ দিয়েছেন। ভীষ্মপর্বের অর্জুনকৃত দুর্গাস্তোত্র দুর্গাকে সরস্বতী বলা হয়েছে। বিরাট পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়েও একটি দুর্গাস্তব আছে। আবার কৃত্তিবাসকৃত বাংলা রামায়ণ অনুসারে রাবণ ও রাম উভয়ে দেবীভক্ত ছিলেন। দুর্গাপূজার মন্ত্রে আছে—'রাবণস্য বিনাশায় রামাস্যানুগ্রহায় চ অকালে বোধিত দেবী।'

পুরাণের মধ্যে বিশেষত বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, কালিকাপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, দেবী ভাগবত, বামনপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বৃহন্নারদীর পুরাণাদিতে শক্তিবাদের আধিক্য দেখা যায়। দেবীভাগবতে আছে—'সেয়ং শক্তির্মহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিণী।'

'রূপং বিভর্ত্যরূপা চ ভক্তানুগ্রহহেতবে।' —সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী মহামায়া পরাশক্তি অরূপা হয়েও ভক্তগণকে কৃপা করবার জন্য রূপ ধারণ করেন। গীতা যেমন মহাভারতের অংশ, চণ্ডী ঠিক সেইরূপ মার্কণ্ডেয়পুরাণের অংশ। মার্কণ্ডেয়পুরাণের ৮১ থেকে ৯৩ অধ্যায় পর্যন্ত ত্রয়োদশ অধ্যায়ের নামই 'চণ্ডী'। দেবীমাহাত্ম্য ও দুর্গাসপ্তশতী চণ্ডীর অপর দুটি নাম। এতে ৭০০ মন্ত্র আছে অথবা ৫৭৮টি শ্লোক আছে। কাত্যায়নী তন্ত্রে চণ্ডীর প্রত্যেক মন্ত্রের স্পষ্টভাবে বিভাগ করা হয়েছে। বারাহীতন্ত্রে ও রুদ্রযামলে চণ্ডীর মন্ত্রবিভাগ সংক্ষিপ্ত। কাত্যায়নী তন্ত্রে আছে—

তস্মাদেতৎ পঠিত্বৈব জপেৎ সপ্তশতীং পরাম্।
অন্যথা শাপমাপ্নোতি হানিং চৈব পদে পদে।।
রাবণাদ্যাঃ স্তোত্রমেতদ্ অঙ্গহীনং নিষেবিরে।
হতা রামেণ তে যস্মাৎ নাঙ্গহীনং পঠেৎ ততঃ।।

চণ্ডীপাঠের সঙ্গে চণ্ডীর ষড়ঙ্গ (কবচাদিত্রয় ও রহস্যত্রয়) পাঠ বিধেয়। ষড়ঙ্গহীন চণ্ডীপাঠকের উপর দেবীর শাপ পতিত হয় এবং পদে পদে বিপদ আছে। রাবণাদি অঙ্গহীন চণ্ডীপাঠ করায় রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত হন। সুতরাং সংকল্পপূর্বক অঙ্গহীন চণ্ডীপাঠ অনুচিত। আবার বলা হচ্ছে শ্রীশ্রীচণ্ডীর ১।৫৫, ৪।১৭, ১১।১০, ১১।১২, ১১।২৪, ১১।২৯ এবং ১১।৩৯ শ্লোক-সপ্তককে সপ্তশ্লোকী চণ্ডী বলে। এই সাতটি শ্লোকের অর্থ-ভাবনা করলেই চণ্ডীতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। মহামায়া তত্ত্বই সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের মূল বিষয়।

চণ্ডীপাঠের বিধি : এই চণ্ডীগ্রন্থ পাঠের নির্দিষ্ট কিছু বিধি আছে। সংযতচিত্তে ব্যক্তি প্রাতঃকালে স্নানান্তে সন্ধ্যা-আহ্নিক সমাপন করে উত্তর বা পূর্বমুখে শুদ্ধাসনে বসে ভক্তিভাবে ও একাগ্রচিত্তে বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও অর্থবোধের সহিত চণ্ডীপাঠ করবেন। আচমন, স্বস্তিবাচনাদি করে, সংকল্প করে, অতঃপর আসনশুদ্ধি, ভূত-শুদ্ধি, পুষ্প-শুদ্ধি ইত্যাদি করে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করে স্ত্রী মন্ত্রে প্রাণায়ামপূর্বক চণ্ডীর পূজা

লেখক—বিশিষ্ট শিক্ষক ও লেখক।

করতে হবে। বলা হচ্ছে—

"লিঙ্গস্থাং পূজারেদ্দেবীং পুস্তকস্থাং তথৈব চ।
মণ্ডলাস্থং মহামায়াং যন্ত্রস্থাং প্রতিমাসু চ।
জলস্থাং বা শিলাস্থাং বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।।"

পরমেশ্বরী মহামায়া দেবীকে বাণলিঙ্গে, চণ্ডীপুস্তকে, মণ্ডলে, যন্ত্রে, প্রতিমাতে, বিষ্ণুশিলায় (শালগ্রামে) বা জলে পূজা করা যাবে।

পুস্তক না দেখে কণ্ঠস্থা চণ্ডীর বিশুদ্ধ পাঠই সর্বোত্তম। অথবা আধারে পুস্তক রেখে পূজা করে নেওয়ার পর নাতি-উচ্চ, নাতিমৃদুস্বরে, নাতিদ্রুত, নাতিবিলম্বিত বেগে অর্থবোধ করে একাগ্রচিত্তে ভক্তিভাবে চণ্ডীপাঠই প্রশস্ত। চণ্ডীপাঠের পরে চণ্ডীপাঠাপরাধ-ক্ষমাপণ-স্তোত্রপাঠ ও দেবীর ধ্যান করে জলগণ্ডুষ ত্যাগ করে জপ সমর্পণ করতে হবে। অতঃপর সাধক নবার্ণ মন্ত্র—'ঐঁ হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডয়ৈ বিচ্চে'—যথাসম্ভব জপ করবে। এই নবার্ণ মন্ত্রের একটি অর্থ উল্লিখিত আছে ডামর-তন্ত্রেঃ ব্রহ্মশক্তি সৎ,চিৎ ও আনন্দভেদে ত্রিবিধরূপে কল্পিতা। ঐঁ দ্বারা মহাসরস্বতীকে সম্বোধন করা হয়েছে। হ্রীং বীজের অর্থভূতা মহালক্ষ্মী। আবার ক্লীং বীজের দ্বারা আনন্দরূপা মহাকালীকে সম্বোধন করা হয়েছে। চামুণ্ডা শব্দের অর্থ-চানাং বুদ্ধীনাং বা সুখানাং মুণ্ডমিব স্তিত যা—বুদ্ধি বা সুখসমূহের মুণ্ডের ন্যায় শ্রেষ্ঠ স্থানে অবস্থিতা যিনি। বিৎ+চ+ঈ = বিচ্চে। বিৎ জ্ঞানবাচক, চ সত্যবাচক এবং ঈ আনন্দবাচক। বিচ্চে শব্দের অর্থ যিনি চিদানন্দরূপিণী ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থ্য আমরা তোমার ধ্যান করি।

প্রত্যেক অধ্যায়ের আদিতে ও অন্তে ঘণ্টাবাদন করতে হয়। মঙ্গলবার ও শনিবার এই দুই দেবীবারে চণ্ডীপাঠ প্রশস্ত। দেবীতিথি অর্থাৎ অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দশীতে চণ্ডীপাঠ বিশেষ ফলপ্রদ। নিত্য চণ্ডীপাঠে অসমর্থ হলে ১ম,৪র্থ, ৫ম, ১১শ অধ্যায়ের ৪টি দেবীস্তোত্র পাঠ করা যাবে। উত্তম চণ্ডীপাঠকের লক্ষ্মণ শাস্ত্রমতে এইরূপ—

"জিতেন্দ্রিয়, সদাচারান কুলীনান্ সত্যবাদিনঃ।
ব্যুৎপন্নাংশ্চ চণ্ডীপাঠরতান্ লজ্জাদয়াবতঃ।।"

জিতেন্দ্রিয়, সদাচারসম্পন্ন, কুলীন, সত্যবাদী, শাস্ত্রজ্ঞ, লজ্জাশীল, দয়াবান ও চণ্ডীপাঠে অভ্যস্ত ব্রাহ্মণ বা সাধক চণ্ডীপাঠের যোগ্য।

কাত্যায়নীতন্ত্রে বলা আছে—

"অঙ্গহীনো যথা দেহী সর্বকর্মসু ন ক্ষমঃ।
অঙ্গষট্কবিহীনা তু তথা সপ্তশতীস্তুতিঃ।।"

অর্থাৎ, অঙ্গহীন হলে মানুষ যেমন সকল কাজে সমর্থ হয় না, দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ষড়ঙ্গরহিত হলে অভীষ্ট ফলপ্রদানে ব্যর্থ হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীর ষড়ঙ্গ-দেবীকবচ, দেবীকীলক, অর্গলা স্তোত্র এবং প্রাধানিক রহস্য, বৈকৃতিক রহস্য ও মূর্তিরহস্য।

চণ্ডীতত্ত্ব : শ্রীশ্রীচণ্ডী বললে তাঁকেই বুঝায় যিনি বেদের ব্রহ্ম ও পুরাণের মহামায়া। যিনি জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্ম, যোগীর নিকট পরমাত্মা ও ভক্তের নিকট ভগবান। যিনি অব্যক্ত অবস্থায় তুরীয় নির্গুণ ব্রহ্ম, আবার ব্যক্ত অবস্থায় ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি অর্থাৎ যিনি নিশ্চল অবস্থায় নির্বিকার, নির্বিশেষ ও নিরুপাধি ব্রহ্ম, আবার সচল অবস্থায় সবিকার, সবিশেষ, সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গকারিনী ব্রহ্মশক্তি। যিনি জীবদেহে সর্বভাবময়ী, সর্বপ্রবৃত্তিময়ী, সর্ব ইন্দ্রিয়স্বরূপিণী, আবার চিৎবস্তু আত্মারূপে অবস্থান করেন। যিনি জীবদেহে ব্যষ্টিভাবে আত্মা, আবার সমষ্টিভাবে বিশ্বাত্মা, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট। যিনি নিজের স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রেখে সমকালে নির্গুণ, সগুণ,অবতার ও আত্মা। যিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। যিনি জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থার সাক্ষী। যিনি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। যিনি অনন্ত নাম ও রূপ ধারণ করে জড় ও চিৎ স্বরূপে প্রকাশিতা। যিনি ভক্তগণকে বর ও অভয়দান এবং অভক্তগণকে মরণ-ভীতি প্রদান করেন। যিনি ভক্তগণকে সমকালে ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করেন। যিনি লীলাময়ী। যিনি জগতের কল্যাণের জন্য নিত্য হতে লীলায় অবতরণ করেন। যিনি অবিদ্যা মূর্তিতে জীবকে সংসারে বদ্ধ করেন, ভোগে আসক্ত করেন। আবার বিদ্যামূর্তিতে বদ্ধ জীবকে আসক্তির বন্ধন হতে মোচন করেন এবং তাঁর স্বরূপে অবস্থিতি করান। যিনি তাঁর আশ্রিত ভক্তগণকে মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করে অমরত্ব প্রদান করেন। যিনি ভক্তগণের অভীষ্ট পূরণের জন্য অতি সৌম্যমূর্তি হয়েও প্রয়োজনমতো অতি ভীষণমূর্তি ধারণ করেন এবং ভক্তগণকে ভীষণ অসুরের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন। যিনি "শরণাগত, দীন ও আর্তগণের পরিত্রাণ-পরায়ণ"। যাঁর কৃপায় অযোগ্য যোগ্য পাত্র হয়, সাধারণ ব্যক্তি অসাধারণ বলে গণ্য হয় এবং পার্থিব ও অপার্থিব সকল অভাব জীবের পূরণ হয় ও বিদ্যা, যশ, ধন, প্রতিষ্ঠা আবার ভক্তি, বৈরাগ্য তপস্যার শক্তি ও মুক্তিলাভ—সকলই সুলভ হয়।

চণ্ডী কথার অর্থ : 'চণ্ডী' কথার অর্থ 'ক্রুদ্ধা, উগ্রা'। চণ্ড শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ চণ্ডী। দুষ্ট দৈত্যদলন কার্যের জন্য ব্রহ্মস্বরূপা ব্রহ্মশক্তিকে যখন শান্তভাব ত্যাগ করে ক্রোধের পূর্ণ মূর্তি বা

● চণ্ডীমূর্তিতে দেবী দুর্গা।

চণ্ডভাব ধারণ করতে হয়; যখন অবতার প্রয়োজনে মা ব্রহ্মময়ীকে মধুকৈটভ-অসুরদলনী তামসী যোগনিদ্রারূপে আবির্ভূতা হতে হয়, তখনই তিনি 'চণ্ডী' নাম ধারণ করেন। অসুরদলন-কার্য রজোগুণের, সেইজন্য তিনি 'চণ্ডী' বা কোপনা সাজেন। ব্রহ্মময়ী অতি স্নিগ্ধ, অতি সৌম্য কিন্তু শরণাগত দেবগণকে বা ভক্তগণকে অসুর-পীড়ন বা সংস্কারের প্রবল অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য অর্থাৎ দেবগণের বা সাধকের হিতার্থে তিনি প্রয়োজনমতো অতি ভীষণ ভাব ধারণ করেন। পরমাত্মা যখন দেখেন তাঁর সন্তানেরা নানা আসুরিক ভাবের নিকট পরাজিত, লাঞ্ছিত ও পীড়িত হয়ে দুঃখের প্রতিকারের জন্য তাঁর শ্রীচরণে প্রপন্ন হয়েছে, তখনই তিনি আর্ত ও প্রপন্ন সন্তানগণের দুঃখ দূর করার জন্য স্বয়ং যুদ্ধবেশে সজ্জিত হয়ে 'চণ্ডী' মূর্তি ধারণ করে তাঁর কুপুত্র অসুরদের নাশ করতে আসেন। করুণায়-ভরা চিত্তে তিনি তাঁর আশ্রিত ভক্তগণকে নির্ভয় করার জন্য নিষ্ঠুর হয়ে তাঁর কুপুত্র অসুরদের বধ করেন এবং অসুরদের জড়দেহের সাথে তাদের দুষ্ট সংস্কাররাশি ধ্বংস করে তাদের প্রতি কৃপা করে তাদের অমৃতময় জীবনদান করেন। অসুরদের নিকটে তিনি চণ্ডী—মূর্তিতে ও আচরণে। দেবগণ চণ্ডী স্মরণ করেন, দেবীর বর ও অভয় পাওয়ার জন্য। কালকে গ্রাস করেন বলে যেমন মায়ের একটি নাম 'কালী', সেইরূপ 'চণ্ড'কে বা 'উগ্র'কে বা রজো-তমোগুণকে বা চণ্ড-মূর্তি মহিষাসুরকে বা শুম্ভ-নিশুম্ভকে গ্রাস করেন বলে তাঁর আর একটি নাম 'চণ্ডী'। যত বড়ই চণ্ডভাব হোক না কেন, চণ্ডী তাকে চূর্ণ করেন। উপাখ্যান ছেড়ে ব্যক্তিগত সাধনার ক্ষেত্রে বলা যায়---সিদ্ধিলাভ করতে হলে রজো-তমোগুণকে সরিয়ে একমাত্র সত্ত্বগুণ ধরে থাকতে হয়। সাধকের কাছে সত্ত্বগুণই প্রার্থনার বস্তু; চণ্ডভাব বা চঞ্চলতা সাধনার প্রধান অন্তরায়। সাধক মনের সেই চণ্ডভাব বা স্বভাবসুলভ চঞ্চলতা মায়ের সাহায্যে দূর করার জন্যই মাকে চণ্ডী বলে আরাধনা করতে হয়। মা চণ্ডী সাধককে সমকালে ভোগ ও মোক্ষপ্রদান করেন। দেবতাদের স্বর্গভোগে বাধাদানকারী অসুরদের বধ করে মা আশ্রিত দেবগণকে স্বর্গভোগ প্রদান করেন। সুরথ রাজার মতো রাজ্যভ্রষ্ট ভোগাকাঙ্ক্ষী সাধক চণ্ডীর কৃপায় শত্রুনাশ করে নষ্ট রাজ্য ফিরে পায় ও দীর্ঘকাল ভোগ করে।

দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণের ফল : দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণে কী ফল, শ্রীশ্রীচণ্ডীর দ্বাদশ অধ্যায়ে তা বর্ণিত হয়েছে। সেসব কথা দেবীর নিজের শ্রীমুখের কথা। বিশ্বাস করলেই ফল পাওয়া যায়। শাস্ত্র বিশ্বাসীর জন্য, অবিশ্বাসীর জন্য নয়। এই কথাটি মনে রাখতে হবে। দেবীর কথাগুলো আমাদের বেদবাক্য ও একমাত্র অবলম্বন। সত্যস্বরূপা তিনি, সুতরাং দেবীর কথাও মূর্তিমান সত্য। জ্ঞানস্বরূপা তিনি, সুতরাং দেবীর কথাও জ্ঞানময়। আনন্দস্বরূপা তিনি, সুতরাং দেবীর কথাও আনন্দের মূর্তি, আনন্দের খনি। যদি কোনো ব্যক্তি ইহলোকের যাবতীয় উন্নতি চায়, তবে তার এই চণ্ডীতত্ত্ব আলোচনা করা কর্তব্য। রোগ, শোক, আপদ-বিপদ প্রভৃতির বিনাশ সাধনসকল জীবেরই কাম্য। আবার ভক্ত ও জ্ঞানী যারা তারা চায় মুক্তি অর্থাৎ জন্মান্তর নিবারণ। গৃহী কিংবা সন্ন্যাসী সকলেরই চণ্ডীতত্ত্ব আলোচনায় লাভ আছে। যদি আমরা বিশ্বাস করে থাকি, অতীন্দ্রিয় বস্তুকে বা ব্রহ্মকে আমাদের ঋষিরা লাভ করেছিলেন, তবে সেই ব্রহ্মকে অনুভূতিতে আনতে হলে ঋষি প্রদর্শিত পথেই যেতে হবে। তবেই চণ্ডীতত্ত্ব আলোচনা করে ফল পাওয়া যাবে।

চণ্ডীতত্ত্ব আলোচনা করলে এই প্রতীতি হয় যে, এই চণ্ডীই জগতের রাষ্ট্রী ও জননী। আমরা তাঁর হাতের পুতুল। তিনিই যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র। তিনিই কর্মফলদাতা। তিনিই জীবের অদৃষ্ট। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে একগাছি তৃণও স্থানচ্যুত করার শক্তি আমাদের বা বিশ্ব সংসারের কারো নেই। এই সংসার মহামায়ার বিরাট মায়া। তিনিই আসল কর্তা, আমরা নিমিত্ত মাত্র। তিনিই জীবকে সংসারে বন্ধন করেন, আবার তিনিই বদ্ধ জীবকে মুক্তি দেন। তিনি প্রসন্ন হলেই বরদায়িনী হন। কল্পতরু তিনি, সেজন্য কামনা অনুসারে জীবকে ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করেন। তিনি তাঁর নিজের চরিত্রকথা বা এই দেবীমাহাত্ম্য শুনলে অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

চণ্ডীগ্রন্থের বিভাগ : শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থ বা দেবীমাহাত্ম্য তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ—দেবীমাহাত্ম্যের উপক্রমণিকা। দ্বিতীয় ভাগ—মূল গ্রন্থ। তৃতীয় ভাগ—রহস্যত্রয়। এক্ষেত্রে ভাগসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

প্রথম ভাগে আবার চারটি বিষয় আছে। যথা—(১) দেবীসূক্ত, (২) অর্গলা-স্তোত্র, (৩) কীলক এবং (৪) চণ্ডীকবচ। এই চারটি স্তোত্র না পড়ে চণ্ডীপাঠ করা নিষেধ। চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করতে হলে বা চণ্ডীপাঠ সফল ও সার্থক করতে হলে, এই চারটি স্তোত্র আগে পাঠ করে এর মর্ম অনুধাবন করা আবশ্যক।

প্রথম ভাগ—দেবীমাহাত্ম্যের উপক্রমণিকা দেবীসূক্ত—ঋগ্বেদের অন্তর্গত আটটি মন্ত্র। এর ঋষি ছিলেন মহর্ষি অম্ভৃণ-এর কন্যা ব্রহ্মবিদুষী বাক্ ব্রহ্মশক্তিকে স্বীয় আত্মারূপে অনুভব করে বলেছিলেন, "আমিই ব্রহ্মময়ী আদ্যাদেবী ও বিশ্বেশ্বরী।"

শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থের মূল উপাদান ও ভিত্তি ঋগ্বেদের এই দেবীসূক্ত। দেবীসূক্তের পরমাত্মাই চণ্ডীগ্রন্থে মহামায়ারূপে বর্ণিত হয়েছেন। সুতরাং বেদের ব্রহ্ম বা পরমাত্মা এবং পুরাণের মহামায়া এক ও অভিন্ন সত্তা। দেবীসূক্তে যা আত্মা, চণ্ডীগ্রন্থে তা-ই মহামায়া। দেবীসূক্তে পরমাত্মার মাতৃভাব বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। পরমাত্মার পিতৃভাব ও মাতৃভাব উভয়ই জীবের উপাসনার বিষয়। দেবীসূক্ত আলোচনা করলে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও স্বর্গাদি-লোকসকল প্রসবিনী ব্রহ্মস্বরূপিনী মায়ের স্বরূপ সম্পর্কে খানিকটা ধারণা হয়।

অর্গলা স্তোত্র : চণ্ডীপাঠের বিঘ্ননাশ, অভীষ্ট সিদ্ধির প্রতিবন্ধ দূর ও বহির্মুখ মনকে অন্তর্মুখী বা মাতৃমুখী করার জন্য এই অর্গলা স্তোত্র পাঠ করতে হয়। অর্গল শব্দের অর্থ খিল বা হুড়কো। যেমন, দ্বারে অর্গল বা খিল দ্বারা বদ্ধ করলে বাইরের কেউ ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না, অনুরূপভাবে এই অর্গলা স্তোত্র পাঠ করলে কোনো বিঘ্ন বা বিপদ আসতে পারে না এবং বাহ্য বিষয় চিত্তক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে না। এই স্তোত্রে মাতৃমহিমার কথা খুব বেশি আছে। সেজন্য এতে সিদ্ধি প্রতিবন্ধক রূপ পাপ নাশ হয়।

কীলক : 'কীলক' অর্থ শাপ। দেবী-মাহাত্ম্য গ্রন্থের উপর মহাদেবকৃত শাপ আছে। এই কীলক স্তুতি সেই শাপের উদ্ধার মন্ত্র। কীলক পাঠ করে চণ্ডীপাঠ করলে মহাদেবকৃত শাপের যেমন উদ্ধার করা হয় তেমনই পাঠকের অভীষ্টসিদ্ধি হয়। কীলক পাঠ না করে যিনি চণ্ডীপাঠ করবেন, তিনি চণ্ডীপাঠের ফল পাবেন না, পূর্ণকাম হবেন না। তাই চণ্ডীপাঠের অধিকারী হতে হলে এই কীলক পাঠ করতে হবে। 'কীলক'-এর আর একটি অর্থ 'চাবি'। তালাবদ্ধ ঘরে চাবি দিয়ে তালা খুলে যেমন ঘরের ভেতর প্রবেশ করা যায়, সেরূপ গহন চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করতে হলে কীলক পাঠ দ্বারা তালা খুলতে হয়। চণ্ডীরহস্য সাধারণের নিকট যাতে সহজে প্রকাশিত না হয়, তাই মহাদেব তা তালা দিয়ে অতি সঙ্গোপনে রাখলেন। যে ভক্ত চণ্ডীরহস্য জানতে চায়, তাকে মহাদেবের এই তালা খুলতে হবে। কীলক-স্তবই এর চাবি। কীলক পাঠ করলেই সেই তালা খুলে যায় আর পাঠকের নিকট চণ্ডীরহস্য প্রকাশিত হয়। 'কীলক'-এর আর একটি অর্থ খোঁটা। যেমন, জাঁতার মধ্যস্থানে খোঁটার গোড়ায় যেসকল ছোলা বা মটর থাকে সেগুলো জাঁতার পেষণে চূর্ণ হয় না, সেরূপ যে সকল ভক্ত ভগবানের পাদপদ্মরূপ 'কীলক' অবলম্বন করে থাকে, তারা সংসারের পেষণের শোকে ও দুঃখে চূর্ণ হয়ে যায় না বরং মহামায়ার আশ্রয় লাভ হয়। অর্গলায় যেমন বিঘ্ননাশ হয়, তেমনি কীলকে অভীষ্টসিদ্ধি হয়।

কবচ : কবচ অর্থ বর্ম বা অঙ্গত্রাণ; যা পরিধান করে থাকলে শত্রুনিক্ষিপ্ত অস্ত্র-শস্ত্রাদি অঙ্গে লাগে না। কবচ দ্বারা দেহ আবৃত রাখলে শত্রুর আঘাত থেকে দেহ রক্ষা হয়। চণ্ডী-কবচ পাঠ করলে আত্মরক্ষা করা যায়। এই কবচ পাঠে নিজের স্থূল দেহ দশদিক হতে আগত বিপদসমূহ থেকে রক্ষা পায়। দেবীকে নিজ স্থূলদেহের বিভিন্ন অংশে কী কী ভাবে ন্যাস করতে হয়; কী প্রকারে নিজের সূক্ষ্মদেহকে অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারকে রক্ষা ও চালনা করার ভার মা চণ্ডীকে দিতে হয়; কী প্রকারে নিজের যশ, কীর্তি, সন্তান-সন্ততি, গৃহপালিত পশুপক্ষী, সম্পদ, ধর্ম, কর্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার দেবী চণ্ডিকাকে দিতে হয়; কী প্রকারে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ পুরুষার্থ কেবলমাত্র ব্রহ্মশক্তির শরণাগত হলে লাভ করা যায়—এই চণ্ডীকবচে তা-ই বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। তাই চণ্ডীকবচ আশ্রয় করলে জীব ইহলোকে বিবিধ ভোগ-সুখ পায় এবং জীবনান্তে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। দেবীসূক্তে চণ্ডিকাদেবীর স্বরূপের কথা পাওয়া যায়। অর্গলা-স্তোত্র পাঠে চণ্ডীপাঠের বিঘ্ননাশ হয়। কীলকে পাঠকের অভীষ্টসিদ্ধি হয়। কবচে দেবীর আশ্রিত হয়ে জীব নির্ভয় হয়।

দ্বিতীয় ভাগ—মূল গ্রন্থ : শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। মা চণ্ডীর তিনটি চরিত্রের কথা নিয়েই চণ্ডীগ্রন্থ। এগুলো হচ্ছে—প্রথম চরিত্র, মধ্যম চরিত্র ও উত্তর চরিত্র। মায়ের প্রথম চরিত্র নিয়ে প্রথম অধ্যায়—মধুকৈটভ বধ। মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয়ের বিনাশার্থে ব্রহ্মার স্তবে আবির্ভূতা এক তামসী (তমোপ্রধানা, যোগনিদ্রারূপা) দেবীর আবির্ভাবের কথা এক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। এই চরিত্রের দেবতা তমোরূপা মহাকালী। মায়ের এই চরিত্রকে ব্রহ্মগ্রন্থি-ভেদ বলে। মধুকৈটভ বধের আধ্যাত্মিক ভাব—লোভ নামক রিপু দমন।

গ্রন্থের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ অধ্যায় মায়ের মধ্যম চরিত্র। এক্ষেত্রে মায়ের দুর্গামূর্তির আবির্ভাব, সসৈন্য মহিষাসুর বধ ও দেবতাগণের মাতৃস্তুতি বর্ণিত হয়েছে। মায়ের এই চরিত্রকে বিষ্ণুগ্রন্থি-ভেদ বলে। মহিষাসুর বধ বা ক্রোধ নামক রিপু দমন এর কাজ। মধ্য চরিত্রের দেবতা মহালক্ষ্মী।

উত্তর চরিত্র : গ্রন্থের পঞ্চম হতে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে। শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্বয়ের অত্যাচারে পীড়িত ও লাঞ্ছিত দেবতাদের দ্বারা দেবী চণ্ডিকার স্তব, অম্বিকা দেবীর কৌষিকী মূর্তিতে

আবির্ভাব, দেবীদূত-সংবাদ, ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ ও শুম্ভ প্রভৃতির সঙ্গে দেবীর যুদ্ধ ও তাদের বধ, দেবতাদের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশক নারায়ণী স্তুতি, দেবীর প্রসন্নতা ও দেবতাদের বরদান, দেবীর ভবিষ্যৎ বিবিধ অবতার গ্রহণের বিবরণ এবং দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণের ফল পঞ্চম হতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। শেষ বা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে মেধা মুনির উপদেশে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের দেবী-আরাধনা ও সিদ্ধিলাভ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। মায়ের এই চরিত্রকে রুদ্রগ্রন্থি ভেদ বলে। শুম্ভ বা কাম রিপু জয়-এর কাজ। মায়ের এই চরিত্রের দেবতা মহাসরস্বতী। চণ্ডী-গ্রন্থে তিন প্রকারের বর্ণনা আছে। ঘটনার বর্ণনা, যুদ্ধের বর্ণনা ও স্তবস্তুতি। চণ্ডীগ্রন্থে মোট চারটি উৎকৃষ্ট স্তুতি আছে। প্রথম স্তব, প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মাকৃত দেবীস্তুতি। এই স্তুতিকে বিশ্বেশ্বরী স্তুতি বলে। প্রলয় সলিলের উপর শয়ান ভগবান বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থিত ব্রহ্মা, বিষ্ণুকে যোগনিদ্রামগ্ন এবং মধু ও কৈটভ নামক উগ্র অসুরদ্বয়ের ভয়ে ভীত হয়ে বিষ্ণুর জাগরণ নিমিত্ত যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়ার উদ্দেশে এই স্তব করেছিলেন।

দ্বিতীয় স্তব, চতুর্থ অধ্যায়ে আছে। মহিষাসুর বধের পর দেবগণ দুর্গাদেবীর এই স্তুতি করেছিলেন। একে মহিষহন্ত্রী স্তুতি বলা হয়। এই স্তুতির বিশেষত্ব হচ্ছে—এই স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবতাদের প্রার্থনায় দেবী এই বর দেন যে, যে মানব এইসকল স্তব দ্বারা দেবীর স্তব করবে, দেবী তার প্রতি সতত প্রসন্না থেকে তার জ্ঞান, ঋদ্ধি, বিভবাদি ধনসম্পদ ও স্ত্রীপুত্রাদি বৃদ্ধি করবেন (শ্লোক, ৩৬-৩৭ দ্রষ্টব্য)। চতুর্থ অধ্যায়ে দেবীর এই বরদানের কথা না থাকলে আমরা কেউ শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের ফল পেতাম না। দেবতাদের হিতার্থে দুর্গামূর্তিতে মায়ের এই অসুর-দলনলীলার সাথে মানুষের কোনো সংস্রব নেই। কিন্তু এই স্তবের ফলে দেবীর বরে মানুষের সঙ্গে দেবগণের ও দেবীলীলার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। এই স্তব অতি মনোরম, ভক্তির বিমল উচ্ছ্বাস।

তৃতীয় স্তব, পঞ্চম অধ্যায়ে আছে। পুনরায় দেবগণ কর্তৃক দেবীর স্তুতি; যা শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধার্থ করা হয়েছে। শুম্ভ ও নিশুম্ভ ইন্দ্রাদি-দেবতাদের অত্যাচার করে স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত করে। দেবীর পূর্বে দেওয়া বর স্মরণপূর্বক বিপদ ও দুঃখের প্রতিকারের জন্য দেবগণ দেবী চণ্ডীর এই স্তব করেছিলেন। এই স্তুতিকে দেবীসূক্ত বলা হয়।

চতুর্থ স্তব, একাদশ অধ্যায়ে আছে। দেবগণ কর্তৃক দেবীর স্তুতি, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পর দেবগণের কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক এই স্তুতি। এই স্তুতিকে নারায়ণী স্তোত্র বলে। গ্রন্থমধ্যে স্তবগুলোর অপূর্বতা সর্বাধিক। এর মধ্যে তিনটি বিষয় একত্রীভূত হয়েছে। দার্শনিক তত্ত্ব, ভক্তিরস ও উচ্চ সাহিত্যের উপাদান। এই তিনের মিশ্রণে স্তবগুলো পরম প্রসন্ন-গম্ভীর হয়েছে। বেদান্তের গূঢ়তত্ত্ব এ সকল স্তবে অনেক জায়গায় ফুটে উঠেছে। জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত—তিন প্রকারের সাধকের রুচি অনুযায়ী ভাবের কথা এই সকল স্তবে রয়েছে। চণ্ডীতত্ত্বের উজ্জ্বলতা ও গভীরতা এইসকল স্তবেই বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে মহাশক্তি সম্বন্ধে যে অনুভূতি, স্তবগুলোর মধ্যে তা পরিস্ফুট। তন্ত্রবিজ্ঞানের দার্শনিকতা জানতে হলে স্তবগুলো পর্যালোচনাপূর্বক জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য।

তৃতীয় ভাগ—রহস্যত্রয় : শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থের শেষভাগে অপরাধ-ক্ষমাপণ স্তোত্রম্, সপ্তশতীরহস্যত্রয় ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের ফল আছে। সপ্তশতীরহস্যত্রয় এখানে আলোচ্য বিষয়। (১) প্রাধানিক রহস্য, (২) বৈকৃতিক রহস্য ও (৩) মূর্তি রহস্য—এই তিনটিকে রহস্যত্রয় বলে। এতে যথাক্রমে মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহা সরস্বতী মূর্তির রহস্যের কথা আছে। দেবী চণ্ডিকাই এই তিনটি মূর্তিতে আবির্ভূতা হন। তিনি স্ত্রীও বটে আবার পুরুষও বটে। মধুকৈটভ বধের জন্য বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপিণী দেবী চণ্ডিকার নাম তমোগুণময়ী মহাকালী। সকল দেবতার শরীর হতে যে অমিতপ্রভা দেবী আবির্ভূতা হয়েছিলেন, তিনিই ত্রিগুণময়ী মহিষদর্শিনী সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী। (চণ্ডী, ২।১০-১৩ দ্রষ্টব্য) তিনি ক্রমে ক্রমে অষ্টভুজা, দশভুজা, অষ্টাদশভুজা এবং সহস্রভুজা হয়েছিলেন।

"সর্বদেবশরীরেভ্যো যাবির্ভূতামিতপ্রভা।
ত্রিগুণা সা মহালক্ষ্মীঃ সাক্ষান্মহিষমর্দিনী।।"

বৈকৃতিক রহস্য-৭

"অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্রভুজা সতী।"

বৈকৃতিক রহস্য-১০

ধূম্রলোচন, চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভাদি অসুরদলন করার জন্য যে কালীমূর্তিতে দেবী চণ্ডিকা আবির্ভূতা হয়েছিলেন, সেই চণ্ডিকাদেবীই সত্ত্বগুণময়ী মহাসরস্বতী।

চণ্ডীগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান : পুরাকালে সুরথ নামক একজন রাজা শত্রুর নিকট পরাজিত হয়ে মনের দুঃখে বনে গমন করেন। ক্রমে তিনি মেধা মুনির আশ্রমে অবস্থান করেন। ধনলোভে স্ত্রী ও পুত্রগণ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ধনবান সমাধি নামক এক বৈশ্য তথায় উপস্থিত হন। রাজ্যহারা রাজা সুরথ

ও পরিবার পরিত্যক্ত বৈশ্য সমাধি মিলিত হলেন। তাঁরা একে-অপরের সমস্যা অবগত হলেন। যে ধনলোভী আত্মীয় ও স্ত্রী-পুত্রগণ তাঁদের পরিত্যাগ করেছে, তাদের জন্যই উভয়ের চিত্ত স্নেহাসক্ত হচ্ছে, তাদের কুশলাকুশল নিয়ে তাঁরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এই মায়ারহস্য সম্বন্ধে অবগত হতে তাঁরা উভয়ে মেধা মুনির সমীপে উপস্থিত হন, মুনিকে প্রশ্ন করেন। মেধা মুনি মহামায়ার স্বরূপ বর্ণনা করেন এবং বহু অবতারের মধ্যে মায়ের তিনটি অবতারের বিবরণ দেন। মধুকৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ ও শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ মায়ের তিনটি অবতারের তিনটি কাজ। দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ করে মেধা মুনির উপদেশে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য দেবীর আরাধনার জন্য গমন করেন। নদীতীরে অবস্থান করে তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ দেবীসূক্ত পাঠ ও তার ভাবার্থ অনুধ্যান করতে করতে তপস্যারত হন। তাঁরা উভয়ে নদীতটে দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করে সংযতচিত্তে পূজা আরাধনা করেন। তিন বছর এরূপে দেবীর আরাধনার ফলে জগদম্বা চণ্ডিকা সন্তুষ্টা হলেন। দেবী প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূতা হয়ে বললেন যে, সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য দেবীর নিকট যা যা প্রার্থনা করছেন তা তাঁরা পাবেন। দেবী তা তাঁদের প্রদান করবেন। স্ব-স্ব প্রার্থনা অনুযায়ী, সুরথ রাজা তাঁর হারানো রাজ্য ফিরে পাবেন ও মৃত্যুর পর সাবর্ণি নামে অষ্টম মনু হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন—এই বর এবং সমাধি বৈশ্যকে মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য তত্ত্বজ্ঞানরূপ বর প্রদান করে দেবী অন্তর্হিতা হন।

উপসংহার : পরিশেষে এই প্রার্থনা যে মা যেন আমাদের সর্বপ্রকারে রক্ষা করেন।

"সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে।।

● পুকুরে সুপ্রস্ফুটিত পদ্মফুল।

সপরিবার দেবী দুর্গার আগমন রহস্য

মহাপূজা দুর্গাপূজা

তনুকুমার রায়

দুর্গাপূজা বাঙালি হিন্দুদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব। বিশ্বের যেখানেই বাঙালি হিন্দুরা বসবাস করেন, সেখানই বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এ পুজো পালন করা হয়ে থাকে। শুধু বাঙালি কেন, অন্যান্য ভাষাভাষী হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ পুজোর বিপুল সাড়া দেখা যায়। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট আয়োজন ও আলোড়ন হয়ে থাকে দীর্ঘস্থায়ী। দুর্গাদেবী মহাদেবী, দুর্গাপূজা মহাপূজা। তাই বলা হয়ে থাকে—দুর্গাপূজা কলির 'অশ্বমেধ যজ্ঞ'। দুর্গাদেবী তাঁর ভক্তের শুধু ভক্তি নয়, ভালবাসাও পেয়ে থাকেন। সেজন্যে মহাতত্ত্বময়ী মহাশক্তি মা দুর্গা কালক্রমে কন্যাস্নেহ প্রাপ্ত হন। সত্যি বলতে কি পিতৃগৃহে কন্যার আগমনের আবহ-আনন্দ ও পিতৃগৃহ থেকে কন্যাবিদায়ের বেদনাবিধুর শাশ্বত চিত্র ফুটে ওঠে এই দুর্গাপূজায়। বাঙালি গৃহের এ ছবি অকৃত্রিম, অনামিক ও অপ্রকাশ্য।

সুরথ সমাধিকৃত বসন্তকালের বাসন্তীপূজা শরৎকালে শ্রীরামচন্দ্রকৃত শারদীয়া দুর্গাপূজায় সম্প্রসারিত হয়েছে। কালক্রমে এই অকালবোধন সংযুক্ত শরৎকালের পূজাই অধিকতর ব্যাপকতা লাভ করেছে। পূর্ববঙ্গের রাজশাহী জেলার তাহেরপুরের প্রখ্যাত রাজা কংসনারায়ণ প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। দেশের প্রায় সকল রাজা জমিদারগণ এতে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন। নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সেখান থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েই নিজ বাটীতে বিপুল ব্যয়ে ঘটা করে দুর্গোৎসব পালন করেন। কংসনারায়ণের দুর্গোৎসবে প্রখ্যাত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী পৌরোহিত্য করেছিলেন। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে দুর্গাপূজা বিপুল ব্যয়সাধ্য উৎসব। তাই দুর্গাপূজাকে 'কলির অশ্বমেধ যজ্ঞ' বললে অত্যুক্তি হবে না। সামন্ত যুগে বিত্তশালী রাজা জমিদারদের গৃহাঙ্গনে সাধারণত আড়ম্বরপূর্ণ দুর্গাপূজা হত। আজ রাজতন্ত্র ও সামন্ত যুগের অবসানে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মুক্ত অঙ্গনে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখন 'বারোয়ারি' অর্থাৎ বার ইয়ারে বা বন্ধুর সহযোগিতায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে নদিয়ার গুপ্তিপাড়ায় প্রথম 'বারোয়ারি' দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দুর্গাপূজার ইতিহাস ও জনজীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করলে বাংলার সমাজ বিবর্তনের একটা রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাই বলব, জীবন, সমাজ ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে দুর্গোৎসব মহা আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি সাংবাৎসরিক নন্দিত ঘটনা।

দুর্গাপূজা আসলে নিছক মহোৎসব ও আনন্দঘন সমাবেশই নয়। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক দিক ছাড়াও এর ভিতরে আছে জীবনকে রমণীয় ও বরণীয় করে তোলার এক অপূর্ব দর্শন ও আত্মিক অনুভূতি। মানুষের সমাজজীবন ও অধ্যাত্মজীবন এ দুয়েরই সুনির্মাণের চেতনা, অকৃত্রিম প্রয়াস ও নব উন্মাদনা। এ অনুভূতি অন্তরের অন্তঃস্থলে বিরাজ করে।

দুর্গাপূজার কথা আলোচনা করতে গেলেই শক্তি সাধনার কথা আসে যায়। এ কথা অবিসংবাদিত সত্য যে জগতে শক্তি আছে এবং একমাত্র শক্তিই আছে। শক্তিকে অস্বীকার করতে গেলেও শক্তির প্রয়োজন। এ শুধু কথার কথা নয়—এ হচ্ছে তন্ত্রশাস্ত্রের এক নিগূঢ় বিশাল সিদ্ধান্ত। জগতে শক্তির বিভিন্ন রূপভেদ থাকলেও মূলত শক্তি এক ও অভিন্ন। হিন্দুধর্মের পূজিত বিভিন্ন দেবদেবী ঈশ্বরের বিচিত্র শক্তির রূপপ্রকাশ মাত্র। এর দ্বারা ঈশ্বরের বহুত্ব প্রমাণিত হয় না। তেমনি ভাবে, শক্তির প্রকাশে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা থাকলেও শক্তি একক, সর্বসমষ্টি।

লেখক—বিশিষ্ট শিক্ষক ও লেখক।

মহাতন্ত্রসার গ্রন্থ শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এ কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছে যা আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করে নিয়েছে। বিজ্ঞানের 'Quantum theory' এর প্রামাণ্য দলিল। শক্তির মধ্যে প্রাণহীন জড়ত্ব নেই—আছে স্বাধীন ইচ্ছাময়তা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত ও অতীত এ মহাশক্তিকে বেদ জগৎপিতা ব্রহ্মপুরুষ নামে আখ্যায়িত করেছেন। আর তন্ত্র তাঁকে মাতৃশক্তির রূপময়তায় আবিষ্কার করে 'মা' বলে সাধনা করেন। মূলত ব্রহ্মপুরুষ ও ব্রহ্মময়ী অভেদ। সেজন্যে শ্রীদুর্গাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও তাত্ত্বিক অনুভবে, আধ্যাত্মিক পরিশীলনে দর্শন করার আন্তরিক প্রয়াস থাকতে হবে আমাদের অন্তরে। ব্রহ্মোপলব্ধি ও আত্মোপলব্ধির লক্ষ্যে যে সাধনশক্তি অর্জন করা একান্ত আবশ্যক দুর্গাপূজা তারই নির্দেশক। সাধন জগতে ও আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে এ পবিত্র বোধের গুরুত্ব অপরিসীম।

শারদীয়া দুর্গাপূজার সাথে যা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত তা হচ্ছে দেবীর বোধন। বিল্ববৃক্ষমূলে বোধন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। 'বোধন' মানে জাগরণ। বোধন যেন দেবীক্ষেত্রে প্রবেশের তোরণ—বোধন যেন মহামানসিক জ্যোতির্বিভাসাবলয় দর্শনের চাবিকাঠি। শরৎকালের পূজাতে ষষ্ঠীর তিথিতে বোধন অবশ্যম্ভাবী। এর একটা আধ্যাত্মিক দিক ও যোগক্রিয়ার বিশ্লেষণ আছে। দেহস্থিত মূলশক্তি মূলাধার পদ্মে কুণ্ডলিনী আকারে বায়বীয়রূপে অচৈতন্যভাবে সুপ্ত থাকে। তাকে শুরু থেকে লব্ধক্রিয়া যোগে জাগ্রত করতে হয়। এই জাগরণ ক্রিয়াই 'বোধন'। শারদীয় আশ্বিন মাস দক্ষিণায়ন ভাগে পড়েছে। তাই দেবীকে নিদ্রিত অবস্থা থেকে জাগিয়ে তাঁর পূজা করতে হয়। এজন্যই শারদীয়া পূজাকে বলা হয় 'অকাল পূজা' বা 'অকাল বোধন'। শরৎকালে দেবীকে পূজা করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র সীতার উদ্ধার কামনায়। শরৎকালের দুর্গাপূজা শ্রীরামচন্দ্রকৃত দুর্গাপূজার পুণ্য স্মৃতিবাহী পূজা। দেবীভাগবত ও কালিকা পুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের পূজার বিষয় বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

বেদ নিরাকার পরম ব্রহ্মের সাধনার কথা ঘোষণা করলেও তা যে শক্তি চেতনা বিরোধী নয় এ কথা ঋগবেদোক্ত দেবীসূক্তে অসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে। তন্ত্রোক্ত দেবীশক্তি 'বাক্' নাম্নী বৈদিক ঋষিকন্যাকে আশ্রয় করে আপন রূপালোক প্রকটিত করেছেন। আজ্ঞাচক্রে ভগবৎ ভাবনার রাজ্যে উন্নীত হয়ে ঋষিকন্যা দেবীশক্তির দর্শন করলেন ও বেদোক্ত মন্ত্রপ্রাপ্ত হলেন। তাই তিনি মহাশক্তি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিনী, বিশ্বাতীতা বিশ্বরূপার পরিচয় প্রদান করেছে। বেদের দেবীসূক্তে মহাশক্তির আবির্ভাবের দ্যোতনা ঘোষিত। তাই বৈদিক নিরাকার সাধক ও তান্ত্রিক সাকার সাধক মাতৃভক্তের মধ্যে কোনো বিরোধ রইল না।

দুর্গাকাঠামোর মধ্যে আমরা জীবন গড়ার প্রেরণা লাভ করি। পদদলিত অসুর ও সর্বোপরিস্থিত মঙ্গলময় শিব উন্নত জীবনতত্ত্ব নির্দেশক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি কোনো জাতিভেদ বা নিষ্প্রাণ বর্ণভেদ নয়। মেধার প্রতীক ব্রাহ্মণ, শৌর্যের প্রতীক ক্ষত্রিয়, ধনের প্রতীক বৈশ্য, গণশক্তির প্রতীক শূদ্র। এই চতুর্শক্তির শুভ সম্মিলনে সমন্বিত শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারলেই জীবন, পরিবার, রাষ্ট্র ও বিশ্ব এক মজবুত বনিয়াদের উপর দাঁড়াতে পারে। জীবন চালনা এক কঠিন অনুশীলন এবং সমস্ত জীবনই বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে চালিত এক প্রলম্বিত সংগ্রাম। ধর্ম কাঠামোকে বাদ দিয়ে জীবন কাঠামো তৈরির স্বপ্ন দেখা অলীক কল্পনা মাত্র। তাই বলব, দুর্গাপূজা জীবন বিচ্ছিন্ন নিছক এক স্বপ্নচারণ নয়, বরঞ্চ এ হল জীবন প্রভাবক, সচেতক এক কৌশলী ক্রিয়া।

দুর্গাপূজায় গণায়নের দিকটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রাহ্মণ, মালী, কুম্ভকার, প্রতিমাকার, তন্তুবায়, নরসুন্দর, সভাসুন্দর, ঋষিদাস, ঢাকী, রূপদক্ষ শিল্পী ও অন্যান্য অনেক স্তরের মানুষ দুর্গাপূজার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে। ফলে দুর্গাপূজা যেন মহামানবের এক দিব্যরস মাধুর্য প্রদাতৃ মহাপার্বণী। বর্ণাশ্রমের প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা, চতুর্শক্তির সংহতির উপর গুরুত্ব আরোপ ও দেশ গঠন কল্পে দুর্গাপূজার তাৎপর্য অনুধাবন যোগ্য। দেবীর মহাস্নানের প্রসঙ্গ এলেই দেশের কৃষিজ, বনজ ও খনিজ সম্পদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এতে করে দেশভাবনা জাগরিত হয়।

দুর্গাপূজা অন্যান্য সকল পূজার মতোই ব্রহ্মবিদ্যাভিত্তিক যোগসাধনের সকল কৌশল পূজায় নিহিত আছে, যোগযুক্ত সত্যাবস্থা লাভ করাই যে দুর্গাপূজার উদ্দেশ্য; আত্মস্বরূপের অনুসন্ধানেই যে ঋষিরা পূজা প্রকৌশল আবিষ্কার করেছেন। অরূপকে রূপময়, বাক্যাতীতকে বাঙ্ময়, সর্বব্যাপ্তকে স্থানিক ও কায়িক অবয়বে স্থাপন প্রভৃতি সাকার সাধক আপন মনের আর্তিবশত করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পূজা হয় মানসোপচারে, ষটচক্রের পদ্মে পদ্মে বিচরণে, উত্থানে, কোলাহলহীন সৌম্য অবস্থায়, শেষ পর্যায়ে দেবতার সাথে যৌগিক সাক্ষাৎকারে ও যোগযুক্ত সত্যাবস্থা লাভে।

● সপরিবারে দেবী দুর্গা।

দুর্গাপূজায় মহাশক্তির জাগরণের মাধ্যমে মর্মলোকে পৌঁছে মর্মকথা ও দিব্য অনুভূতি উপলব্ধি করতে হবে। দেবতা পূজা দেবতার জন্য প্রয়োজন নয়। দেবতা পূজার মাধ্যমে দেবতার মঙ্গল সাধন আমাদের লক্ষ্য নয়। বরঞ্চ দেবপূজার সোপান বেয়ে আমাদের আত্মকল্যাণ স্তরে উপনীত হওয়ারই প্রয়াস পাই। দুর্গাপূজার শিক্ষা হল অসুর শক্তিকে পরাজিত করে দেবীশক্তি তথা শুভ শক্তির উত্থান ঘটাতে হবে। নিপীড়ন ও অসহায়ত্বের নাগপাশ থেকে নিজেকে বিমুক্ত করে বিজয়ের ধ্বজা উত্তোলন করতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের অর্জন করতে হবে সচ্চিদানন্দলোকে বিরাজ করার ক্ষমতা।

সৃষ্টিরাদ্যা মা দুর্গা দেহদুর্গেরও মূল শক্তি। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুদ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতে মানবের স্থূলদেহ নির্মিত। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য—এই ষড়রিপু কর্তৃক আক্রান্ত হয় দেহের মূল শক্তি—প্রাণশক্তি। উপনিষদে এই প্রাণেরই জয়গান। প্রাণ তার স্বরূপে বিকশিত হয় সাধনায়। প্রাণশক্তির উদ্বোধনে উপলব্ধিতে সাধক হন মহাশক্তিধর। শাস্ত্রে আছে, "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা।" প্রতিমা পূজার প্রকৃত লক্ষ্য আত্মসাক্ষাৎকার। উপনিষদের মহাবাণী, "আত্মানং বিদ্ধি।" আত্মাকে জান। কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে বলেছিলেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত।" উঠ, জাগ, শ্রেষ্ঠকে লাভ করে প্রবুদ্ধ হও। দুর্গাপূজায়ও একই উদ্দেশ্য—মহাশক্তির আত্মসাক্ষাৎকার।

পূজামণ্ডপে দুর্গাপ্রতিমার দিকে নিরীক্ষণ করলেই আমরা দেখি তেজোদীপ্ত মা দুর্গার মহারণরঙ্গিনী মূর্তি। পদতলে মহিষাসুর বিমর্দিত, ভূলুণ্ঠিত। দুর্গাকে আক্রমণ করছে বিপুল বিক্রমে। দুর্গাবাহন সিংহও আক্রমণ করছে মহিষাসুরকে। দেবী দশভুজা দশপ্রহরণ ধারণ করে আক্রমণ করছেন মহিষাসুরকে। ভীষণ এই রণরঙ্গেও তিনি প্রসন্নবদনা। দেবীর শিরোদেশে দেবাদিদেব মহাদেব অধিষ্ঠিত। দেবীর ডানপাশে ঐশ্বর্যদাত্রী দেবী লক্ষ্মী, তাঁর নীচে সিদ্ধিদাতা গণেশ, দেবীর বামপাশে সরস্বতী তাঁর নিচে দেবসেনাপতি কার্তিক। কিন্তু এই প্রতিমা কাঠামোর অধিষ্ঠিত মধ্যে মূল শক্তি দুর্গা। তাকালেই মনে হয় অসুরশক্তিকে পদদলিত করতে পারলেই যেন লাভ করা যায় মহাসুন্দর, সত্য, শিবকে মাথার উপরে।

দেবী দুর্গা সমস্ত দেবতার সম্মিলিত তেজ থেকে আবির্ভূতা। "সমস্ত দেবানাং তেজোরাজি সমুদ্ভবাম্"।

দেবী বলেন—

"ইমং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদাতাদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসং ক্ষয়ম্।।"

(শ্রীশ্রীচণ্ডী—১১/৫৫)

যখন যখন এরূপ দানবজনিত অত্যাচার হবে তখন তখন আমি অবতীর্ণ হয়ে শত্রুনাশ করব। এ যেন মহাশক্তির মহা অভয় বাণী। সাধক যখনই রিপুর দ্বারা পথভ্রষ্ট হন, তখনই দৈবশক্তি আবির্ভূত হয়ে তাকে রক্ষা করেন। তেমনি দুর্গা সাধকের নিজের ও বিশ্বের মূল মহাশক্তি।

দুর্গার দশ হাত খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই দশ হাত দশ দিক (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈর্ঋত, ঊর্ধ্বঃ, অধঃ) রক্ষা করার প্রতীক। দশদিকের সকল বিপদ থেকে তিনি সাধককে রক্ষা করবেন।

মা দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী। এ সকল অস্ত্র এক এক দেবতার সাধনশক্তি লব্ধ বিভূতি। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উল্লেখ আছে, দেবীকে দেবতারাই দিয়েছিলেন সে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র। দেহের অসুরশক্তি নাশ করার জন্য সাধকের প্রয়োজন ওই সমস্ত অস্ত্র।

শ্রীদুর্গা প্রসন্নবদনা। ঘোর যুদ্ধে রত থাকলেও ঐশ্বর্য বা বিভূতি লাভ করে তাঁর দিব্য চোখে-মুখে ফুটে ওঠে স্বর্গীয় প্রশান্তি। এই প্রসন্নতাই তাঁকে আরও মায়াময় করে তুলেছে।

দেবী ত্রিভঙ্গা। এই ত্রিভঙ্গি ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির প্রতীক। ঈড়া নাড়ীতে রজো, পিঙ্গলা নাড়ীতে তমো এবং সুষুম্না নাড়ীতে সত্ত্বগুণ সাধনার ভাবদ্যোতক। তিনি ত্রিগুণময়ী আবার ত্রিগুণাতীতা।

মা দুর্গা ত্রিনয়নী। একটি নয়ন চন্দ্রস্বরূপ, আর একটি সূর্যস্বরূপ, তৃতীয়টি অগ্নিস্বরূপ। তাঁর ত্রিনয়নের ইঙ্গিতেই নিয়ন্ত্রিত হয় ত্রিকাল। আমরা চন্দ্রালোকে রাত্রিতে দেখি, সূর্যালোকে দিনে দেখি এবং অগ্নির আলোকে দিবা-রাত্রির সন্ধিস্থল সন্ধ্যায় ও উষায় দেখি। দেবীর দৃষ্টি সর্বকাল বিস্তারী। তাঁর সংস্পর্শে সাধক হয়ে ওঠেন সর্বজ্ঞ।

দেবী জটাজুটধারী। এই জটা বৈরাগ্যের প্রতীক। তিনি অর্ধেন্দুশেখর। তাঁর কপালে অর্ধচন্দ্র বিরাজ করছে। অর্ধচন্দ্র স্বর্গীয় অধ্যাত্ম শান্তিপ্রাপ্তির প্রতীক।

দেবী মহাজ্যোতির্ময়ী। আকাশে সহস্র সূর্যের প্রভা যদি এক কালে উদিত হয় তবে তা সেই মহাত্মার প্রভার সদৃশী হতে পারে।

"দিবি সূর্য সহস্রস্য ভবেদযুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ" ।।

(গীতা-১১/১২)

দেবীর অঙ্গকান্তি অনিন্দ্যসুন্দর, অতসী পুষ্পের মতো। এই অপরূপ সাধক জ্ঞাননেত্রে প্রত্যক্ষ করেন।

মা নবযৌবনাসম্পন্না, পীনোন্নত পয়োধরা। সাধনশক্তি নবযৌবন শক্তির মতোই তেজবীর্যময়। মা বিশ্বজ্ঞানী। বিশ্বের সন্তানের লালন-পোষণকারিণী। উন্নত পয়োধর মাতৃত্বের প্রতীক, সাধকের জন্য অমৃতবর্ষী। সাধক এই অমৃত রসধারায় তৃপ্ত করেন অন্তরাত্মাকে।

দেবী নানালঙ্কার ভূষিতা। দেবতাগণ দেবীর প্রতি প্রীত হয়ে এইসমস্ত উজ্জ্বল বহু মূল্যবান অলংকার প্রদান করেছেন। এই সকল অলংকার মহাদেবীর শক্তির বিভূতির প্রতীক।

দেবী সিংহবাহনা। ইহা তাৎপর্যপূর্ণ। সাধন সমরকালে দেহস্থ পশুশক্তি ও সাধকের সহায়ক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তাই দেখা যায়, সিংহ দেবীর পক্ষে মহিষাসুরকে বিপুল বিক্রমকে আক্রমণ করে।

মহিষাসুর—দেহস্থ প্রবল রিপুর প্রতীক। "মহীং ঈষ্যতি ইতি মহিষঃ।" মহীকে যে কামনা করে সে মহিষ। অর্থাৎ পৃথিবীতে যার উগ্র ভোগাকাঙ্ক্ষা আছে সে-ই মহিষাসুর।

মহিষাসুর উগ্র ইন্দ্রিয়শক্তির প্রতীক। দুর্গাপূজায় দেবীর জয়, পরাজয় অসুরের। জয়লাভ করে দেবী হন বিজয়া। তিনি অপরাজিতা। দশমীতে এই অপরাজি তাকে পূজা করার বিহিত ব্যবস্থা আছে। পক্ষান্তরে সাধন সংগ্রামে জয়ী হন সাধক। মহিষাসুর রজোগুণের প্রতীক। তাই দেবীর রজোগুণ নির্দেশক বাম পদ মহিষাসুরের বুকে স্থাপিত। দেবীর তমোগুণ নির্দেশক ডান পদ স্থাপিত সিংহের উপরে।

শিবকে আমরা বলি দেবাদিদেব মহেশ্বর। তিনি অধিষ্ঠিত সর্বোপরি। শিব হলেন মঙ্গল ও স্থিরত্বের প্রতীক। শিব ক্রিয়াতীত, গুণাতীত, শুভ্র, নিত্য, নিরঞ্জন। শিব সত্য সুন্দর। শিব পূজা হয় লিঙ্গে। 'লয়নাৎলিঙ্গমিত্যাহু।' যাতে সবকিছুরই লয় হয় তাই লিঙ্গ। তাঁর শিরে সর্প। সর্প কুণ্ডলিনীর প্রতীক। কুণ্ডলিনীর অবস্থান মূলাধার পদ্মে—মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে। সাধক কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে ঊর্ধ্বে শিরে সহস্রারে উত্থিত করেন। এরই প্রতীক শিবের শিরস্থ সর্প। শিব বৃষবাহন। বৃষ ক্রোধের প্রতীক। ক্রোধ অবদমিত এবং বীর্যে রূপান্তরিত হয়ে সাধন সহায়ক হয়।

গণেশ কার্তিক—দুর্গার সন্তান। কিন্তু গর্ভজাত সন্তান নন। গণেশ ধীর-স্থির ব্যক্তিত্বের সাধক। তিনি সিদ্ধি ও সিদ্ধিদাতা। বিঘ্ননাশক। গণেশের লম্বোদর—ন্যাস প্রাণায়াম সাধনার প্রতীক। শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড ছিন্ন হয়েছিল। বিকল্প হিসেবে গজমুণ্ড স্থাপন করা হয়েছে। এ মুণ্ডের উপরিভাগ শুভ্র যা সাধনালব্ধ কূটস্থ জ্যোতির উদ্ভাস প্রতীক। শুঁড় বাম বক্ষের দিকে নির্দেশ করে। আসলে বাম বক্ষ যোগক্রিয়ার নির্দেশক। কঠোর সাধনায় সাধক বাহ্য ছিন্ন মুণ্ড অনুভব করেন। এ যেন জ্যোতির্ময় শুভ্র মুণ্ড। দশমহাবিদ্যার এক বিদ্যা ছিন্নমস্তাতে এই যোগ প্রতীক দৃষ্ট হয়। গণেশের বাহন মূষিক। তার কাজই হল কর্তন করা বা ছিন্ন করা। সে বন্দি থাকতে চায় না। তাই মূষিক বন্ধনমুক্তির প্রতীক।

কার্তিক দেবসেনাপতি, চিরকুমার, সমস্ত দেবশক্তির পরিচালক। কার্তিকের অস্ত্র ধনু। প্রণব (ওঁ) ধনু, শর হচ্ছে আত্মা এবং লক্ষ্য ব্রহ্ম। "প্রণবঃ ধনু শরেহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।" ধনুক যোগক্রিয়ার প্রতীক। ধনুকের সাহায্যে লক্ষ্যভেদ করে অর্জুন পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করেন। তেমনি শ্রীরামচন্দ্র ধনুকের সহায়তায় পান জনক রাজার কন্যা সীতাকে। কার্তিকের বাহন ময়ূর। ময়ূরের কামপ্রবৃত্তি অতি ক্ষীণ। তাই সে মৈথুনকর্ম করে না। মেঘের শব্দে ময়ূর নৃত্য করলে তার বীর্যপাত ঘটে। সেই বীর্য খেয়ে ময়ূর গর্ভবতী হয়। তেমনি সাধক যখন কার্তিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন কামভাব একেবারে কমে যায়। আবার ময়ূরপুচ্ছে যে তিসি ফুলের মতো রং দৃশ্যমান হয় তা সাধক কার্তিক অবস্থায় পৌঁছলে অন্তর্জগতে দর্শন করে থাকেন। তাই ময়ূর দেবসেনাপতির কামভাবহীনতা ও অন্তর্লোকে বিশেষ জ্যোতি দর্শনের প্রতীক।

সরস্বতী বিদ্যাদেবী, জ্ঞানদাত্রী। তিনি শ্বেতপদ্মাসনা, শ্বেতালংকার ভূষিতা ও শ্বেতবীণা হস্তে ধারণ করে আছেন। তাঁর শুভ্র বসন জ্ঞানের নির্মল শুভ্রতার প্রতীক। তিনি বীণার সঙ্গে পুস্তকধারিণী। বীণা মেরুদণ্ডের প্রতীক। মেরুমধ্যস্থ সুষুম্না মার্গে সাধক ক্রিয়াবান থাকলে বিশুদ্ধাখ্য চক্রে (পঞ্চম চক্রে) উত্থিত হয়ে শুভ্রজ্যোতি দর্শন করেন। ফলে সাধক হন সর্বজ্ঞানের অধিকারী।

তাই দেখা যায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণ না করেও অনেক সাধক হয়ে ওঠেন পরম জ্ঞানী। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও কবি কালিদাস এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অনাহত চক্র অতিক্রম করেই সাধক বিশুদ্ধাখ্য চক্রে পৌঁছে শুনতে পান এক অশ্রুতপূর্ব সুমধুর ধ্বনি। দেবীর হাতের পুস্তক জ্ঞানচর্চার প্রতীক। সরস্বতী হংসবাহনা। হংস হচ্ছে প্রাণ। সাধক হংসে স্থিত হয়ে জ্ঞানামৃত পান করেন। হংস হল জীবাত্মার প্রতীক। জীবাত্মা যখন সাধন

স্তরের উচ্চমার্গে পৌঁছে যান, তখন হয় পরমহংস অবস্থা। তাই দেখি রাজহংস সারগ্রহণ করে, অসার ত্যাগ করে।

লক্ষ্মী ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই ঐশ্বর্য আধ্যাত্মিক যোগকর্মলব্ধ পরম ঐশ্বর্য—স্বর্গীয় বিভূতি। পেঁচক লক্ষ্মীর বাহন। সে অন্ধকারের মধ্যেও জ্যোতিরেখা দর্শন করে। দিনে দেখে না, রাত্রে দেখে। অর্থাৎ জাগতিক মানুষের ঠিক বিপরীত। সাধক লক্ষ্মী অবস্থা প্রাপ্ত হলে ঘনঘোর তমসায়ও অলৌকিক জ্যোতি দর্শন করেন।

একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কিছু না লিখলে আমার প্রবন্ধ লেখা শেষ হয়েও হবে না শেষ। কারণ এই বিষয়টি দুর্গাপূজার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই বিষয়টি হল মহালয়া, যা থেকে দেবীপক্ষ শুরু হয়। ভাষাগতভাবে বলতে গেলে মহতের আলয় মহালয়। এই দিন আমরা পিতৃপুরুষের পারলৌকিক আত্মার কল্যাণার্থে তর্পণাদি পালন করে পরম তৃপ্তি লাভ করি। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে তিনটি অমাবস্যা সুপ্রসিদ্ধ। (১) আলোক অমাবস্যা, (২) মহালয়া অমাবস্যা, (৩) দীপান্বিতা অমাবস্যা। প্রত্যেকটির নিগূঢ় তত্ত্ব আছে। মহালয়া মানে মহাকূটস্থ দর্শন ক্ষেত্র। মহালয়ায় মহাকূটস্থ দর্শন করে ক্রমান্বয়ে প্রথমা থেকে শুরু করে পঞ্চমী পর্যন্ত তিথিতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতকে শোধন করেন। ষষ্ঠী তিথিতে তখন তাঁর হয় আত্মবোধন।

শারদীয়া দুর্গাপূজায় 'বোধন' পূজার কর্মাঙ্গীভূত একটি বিশেষ পূজাক্রিয়া। শরৎকালে দুর্গাপূজা করা হচ্ছে বলেই বোধন পূজা করার বিধান আছে। বোধন মানে জাগরণ। শরৎকালে হয় দেবীর অকালবোধন, যা শ্রীরামচন্দ্র করেছিলেন সীতা উদ্ধারের জন্যে। শরৎকালের পূজাতে ষষ্ঠী তিথিতে বোধন অবশ্যম্ভাবী। পূজা সাধকের আত্মবোধনের রূপক। বোধন অনুষ্ঠানে হয় নবপত্রিকা সংস্থাপন। নবপত্রিকা হচ্ছে—

"রম্ভা কচ্চী হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিল্বদাড়িমৌ।
অশোক মামকচ্চৈব ধান্যঞ্চ নব পত্রিকা।।"

উদ্ভিদ জগতের প্রতিনিধি স্থানীয় নয়টি উদ্ভিজ্জে দেবীর অনুভূতি লাভ করা হচ্ছে। এই নয়টি উদ্ভিজ্জকে অপরাজিতা লতা দিয়ে বাধতে হয়। এই অপরাজিতা অর্থাৎ যিনি কখনও পরাজিত হন না তিনি প্রাণশক্তি। 'সর্বভূতে প্রাণের স্থিতি ভাবের রীতি চমৎকার।' আমরা দেবীর বোধন করি। আসলে কিন্তু করা হয় সাধকে আত্মবোধন, আত্মজাগরণ। মনের হয় বোধন ষষ্ঠী তিথিতে। সপ্তমীতে বুদ্ধি জয়, অষ্টমীতে অহংকার জয়। অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিলগ্নে সন্ধিপূজা হয়। সন্ধিতে ৬৪ যোগিনী পূজা ও ভূত পূজা ইত্যাদি করতে হয়। ভূতশুদ্ধি না হলে পূজার অধিকার হয় না। নবমীতে নবম অবস্থা—অহংবোধ বিনাশের পরবর্তী স্তর। তাই নবমী পূজা সংক্ষিপ্ত। দশমীতে দশম অবস্থাপূর্ণ বিজয়। তখন দেবীশক্তির নিরঞ্জন। নিরঞ্জন শিবের সাথে মিশে গিয়ে তিনি নিরঞ্জন হয়ে যান। বাহ্যত প্রতিমার বিসর্জন হল জলে। আসলে ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার ধারার অতীত হয়ে সাধক ক্রিয়াহীন শবাকার শিবে লয়প্রাপ্ত হন। বিসর্জন অনুষ্ঠানে তারই প্রকাশ। তিনি বিন্দুবাসিনী। বিন্দু থেকে জগতের সৃষ্টি, আবার লয়প্রাপ্ত হয় বিন্দুতে। তাই দশমীতে করি বিন্দুবাসিনী পূজা। এই দশমী বিজয়া দশমী। অসুরশক্তির বিরুদ্ধে সুরশক্তি অর্থাৎ সাধনশক্তির বিজয়ের উৎসব। একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী ও চতুর্দশী অবস্থা শুধু সাধনগম্য, অনির্বচনীয়। পঞ্চদশীতে পূর্ণিমা— মহাজ্যোতির উদ্ভাস। এই পূর্ণিমা লক্ষ্মীপূর্ণিমা। সাধক তখন সর্ব ঐশ্বর্য লাভ করে সিদ্ধ অবস্থা পেয়েছেন। এই পূর্ণিমাকে বলা হয় কোজাগরী পূর্ণিমা। কঃ জাগর? কে জাগ্রত। প্রাণই জাগ্রত দেহমধ্যে। এই প্রাণের উপলব্ধি সাধকের তখন পূর্ণভাবে ঘটে।

আমরা আমাদের দুর্গতি (দুঃখময় গতি) নাশের জন্যে দুর্গাপূজা করি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে। প্রাণভিত্তিক যোগ প্রক্রিয়া এক অনির্বচনীয় মহা সুখময় গতি দান করে। তাই প্রত্যেক প্রতিমা পূজায় প্রথমেই করতে হয় প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। প্রাণপ্রতিষ্ঠা না করে পূজা বৈধ নহে। পূজারি অর্থাৎ সাধক পঞ্চভূতময় দেহকে করেন পরিশুদ্ধ। আসনশুদ্ধি, পূজায় বসেই প্রথমে করতে হয়। তারপর দেবীর ধ্যান করে করে "নিজেই দেবী" (দেবীং সোহমিতিবিচিন্ত্য) এই কথা চিন্তা করে নিজের মস্তকে পুষ্প দিয়ে (স্বশিরসি পুষ্পং দত্তা) দেবীকে মানসোপচারে পূজা করতে হয়। বাহ্য ষোড়শ উপাচারে পূজা হয় পরে। তারপর ঘটস্থাপন করে পূজা করতে হয়। ঘট দেহের প্রতীক। "দেহমধ্যে প্রাণযজ্ঞ করবে যাজন। সদ্‌গুরুর উপদেশ লাভ করে সাধনায় এই প্রাণযজ্ঞ করে যেজন।" তবেই হয় সত্যিকারের পূজা অনুষ্ঠান।

মহাশক্তি দুর্গাপূজা করে আমরা আত্মবলে বলীয়ান হব, হব মহাশক্তির অধিকারী, হব সত্যনিষ্ঠ। এখানেই দুর্গাপূজার তাত্ত্বিক রহস্য।

কুমারী পূজার রহস্য

অধ্যাপক ইন্দ্রনীল কুণ্ডু

বর্ষার শেষে শরতের সমাগমে বাংলার আকাশে-বাতাসে যে মহামায়ার পদধ্বনি অনুরণিত হবে আর সেই ধ্বনিতে সুর মিলিয়ে জগন্মাতাকে বরণ করে নেবে নবীন ধানের মঞ্জরী, কাশের গুচ্ছ এবং জলশূন্য পেজাতুলার ন্যায় সাদা মেঘের সাথে ভোরের বেলায় ঝরে পড়া শুভ্র শেফালিকা পুষ্প সেই বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আত্মপ্রকাশকালে দেবী একাধিকবার বলেছেন যে, এই ত্রিভুবনে তিনি ব্যতীত অপর কোনো বস্তু বা ব্যক্তির অস্তিত্ব শূন্য, সমগ্র জগৎ শুধুমাত্র তাঁরই বিভূতি। সুতরাং বিশ্বমাঝারে যে রূপে (মৃন্ময়ী বা চিন্ময়ী) যে আধারে (ঘট, পট, জল, যন্ত্র, পুষ্প, বিগ্রহ) দেবার্চনা হোক না কেন তা শুধুমাত্র জগন্মাতার অর্চনা ব্যতীত অপর কিছুই নয়। বৃষ্টিধৌত, পুষ্পসৌরভে সুভাষিত সমগ্র ভারতবর্ষ চান্দ্র- আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ থেকে শুক্লা নবমী অবধি (নয় দিন ব্যাপী) আত্মনিবেদন করে জগন্মাতার বেদীমূলে আপন উন্নতিকল্পে। বঙ্গদেশে বহুল প্রচলিত দশভুজা কাত্যায়নী মূর্তির অর্চনার সাথে দক্ষিণ ভারত এবং সুদূর উত্তর ভারতের সাধকগণের নবরাত্রি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের বাহ্যিক পার্থক্য লক্ষ করা গেলেও এক সূক্ষ্ম অদৃশ্য যোগসূত্র বিদ্যমান উভয়ের মধ্যে আর এই সাদৃশ্য সূত্র হল কুমারী পূজা। অর্চিতা মৃন্ময়ী মূর্তির সামনে শুদ্ধসত্তা সম্পন্ন বালিকাকে শাস্ত্রবিহিত পদ্ধতিতে অর্চনা কুমারী পূজা নামে খ্যাত।

বঙ্গদেশে কুমারী পূজা : আবেগপ্রবণ রসপ্রিয় বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে দুর্গাপূজা সর্ববৃহৎ ধর্মীয়ানুষ্ঠান এবং দুর্গা পূজাঙ্গীভূত অনুষ্ঠান তথা পূজার সমূহের মধ্যে কুমারী পূজা ও সন্ধিপূজা জনগণের মধ্যে বিশেষ চিত্তাকর্ষক ও ফলদায়িনী। বঙ্গদেশের অধিকাংশ সার্বজনীন ও বনেদি বাড়ির দুর্গোৎসব স্মার্ত বিধানানুসারে পৌরাণিক মতে সম্পন্ন হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই কুমারী পূজাও পৌরাণিক বিধি অনুসারে সাধিত হয়। সাধারণত মহাষ্টমী বা মহানবমী তিথিতে বস্ত্র, মাল্য অলংকারে সুসজ্জিতা কুমারী কন্যাকে বাদ্যবাদনরতাবস্থায় দেবমন্দিরে আনয়ন ও সুন্দর সুসজ্জিত ভদ্রপীঠে স্থাপনপূর্বক বিধিসম্মত উপায়ে অর্চনার মাধ্যমে কুমারীর মধ্যে দৈবীশক্তির উন্মেষ ঘটান হল প্রকৃত কুমারী পূজা। এই দৈবশক্তির জাগরণ শুধুমাত্র প্রলাপ নয় বাস্তবে যে সত্যই কুমারীর মধ্যে দৈবশক্তি জাগ্রতা হয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় হিমালয় ভ্রমণকালে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক কুমারী পূজা সম্পাদন মুহূর্তে। স্বামীজি স্বীয় অনুভূতিতে উপলব্ধি করেন যে অর্চিতা নবকন্যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠা কন্যাটি দৈবীভাবে ভাবিতা ও আংশিক সমাধিস্থা। তবে এই দৈবীলক্ষণ প্রকাশ নির্ভর করে কুমারীর শুদ্ধসত্তা এবং পূজারির আধ্যাত্মিক শক্তির ওপর। সাধারণত পারিবারিক পূজাগুলিতে বাড়ির বয়ঃজ্যেষ্ঠা রমণীগণ কুমারী পূজায় পূজারির পদে ব্রতী হন। আবার কোনো কোনো স্থানে মূল পূজারিও কুমারী পূজা করেন। অতিরিক্ত আতিশয্য না থাকলেও সাধারণত পাদ্য, অর্ঘ্য, কুঙ্কুম, ধূপ এবং অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সহযোগে কুমারী দেবীর পূজা সম্পন্ন করা হয়। শাস্ত্রে এক থেকে ষোলো বছর বয়স অবধি বালিকাগণকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করে পূজার বিধান থাকলেও কন্যা ঋতুমতী না হওয়া অবধি পূজ্যা এবং পূজাকালে বয়সানুসারে নির্ধারিত নামোল্লেখ না করে পূজা করলে সেই পূজা ফলহীন হয়। কুমারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুলক্ষণা এবং পূজারির নিজ বর্ণ অথবা উন্নত বর্ণসম্পন্না কন্যাকে নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছে শাস্ত্র। কুরূপা, তির্যক দৃষ্টিসম্পন্না, কুটিল কন্যা কুমারী পূজার যোগ্যা নহে। পুরাণে কুমারীর রূপ চিন্তনের ক্ষেত্রে দেবীকে কমলারূঢ়া, তপ্ত কাঞ্চন বর্ণা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, রক্তমাল্য শোভিতা এবং বরাভয় দানকারী মাতৃমূর্তির কথা বলা হয়েছে। বৃহদ্ধর্ম পুরাণের বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে রাবণবধের নিমিত্ত দেবগণ (ব্রহ্মা সহ সকলে) দেবীকে প্রবুদ্ধ করবার অভিপ্রায়ে দেবীর স্তুতি করলে সেই স্তবে সন্তুষ্টা দেবী সর্বপ্রথম কুমারী রূপে আবির্ভূতা হন এবং বিল্ববৃক্ষ

লেখক—বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গ্রন্থকার।

● কুমারী পূজা।

মূলে দেবীর বোধনকর্মের জন্য পরামর্শ দেন। বোধনকালেও দেবী সর্বপ্রথম নিদ্রিতা বালিকা মূর্তিতে বিল্বপত্রে আবির্ভূতা হন এবং পরবর্তীতে নিদ্রাত্যাগপূর্বক চণ্ডিকা মূর্তি ধারণ করে সবংশে রাবণ নিধনের বর প্রদান করেন। সুতরাং শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে কুমারী মূর্তির তাৎপর্য ও গুরুত্ব সহজেই অনুভবযোগ্য। শারদীয়া পূজাকালে কুমারী পূজার সংকল্পে উল্লেখ করা হয় যে পূর্ণ ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে পূজারি কুমারী পূজায় ব্রতী হয়েছেন। বাঙালির আত্মপ্রাণোৎসব এই শারদীয়ায় বহুলপ্রচলিত ও বহুদৃষ্ট কুমারী পূজার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলেও তন্ত্রের দৃষ্টিতে কুমারী পূজার গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

তন্ত্রে কুমারী পূজার গুরুত্ব এবং প্রাধান্য বিষয়ে প্রায় সকলেই অবগত। যামলে যেমন বয়সানুসারে কুমারীর নামকরণ করা হয়েছে, জ্ঞানার্ণবে তেমনি কুমারী পূজার সুফল বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বয়ং শিব বলেছেন যে, কুমারী পূজা ব্যতীত হোমাদি কর্ম যেমন পূর্ণতা লাভ করে না, ঠিক তেমনি কুমারী পূজা যথাবিহিত সম্পন্ন হলে সেই কর্মের কোটিগুণ ফলপ্রাপ্তি হয়। কুমারীকে পুষ্প প্রদান করলে মেরুসদৃশ ফলপ্রাপ্তি এবং তৃপ্তি সহকারে ভোজন করালে ত্রিলোক ভোজন করানোর পুণ্য প্রাপ্তি হয়। কুমারী সাক্ষাৎ যোগিনী তথা দেবতা হওয়ায় কুমারী অর্চনের ফলে শুধুমাত্র দেবগণ নয় অসুর, দুষ্ট গ্রহ, বেতাল, গন্ধর্ব, ডাকিনী, যক্ষ, রাক্ষস, ত্রিলোক, রুদ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, সদাশিব সকলেই উপাসকের প্রতি তৃপ্ত হয় এবং উপাসক দেব-করুণা লাভে সমৃদ্ধ হন। পুষ্প অর্চনা ব্যতীত আপন দায়িত্ব ও অর্থ ব্যয় সহকারে কুমারীর বিবাহকর্ম সম্পাদন করা হলে কর্তা গোহত্যা এবং স্ত্রীহত্যার ন্যায় পাপ মুক্ত হয় এবং কর্তা চিরকাল ত্রিলোচন ভগবান রূপে রুদ্রলোকে বিরাজ করেন। রুদ্র যামলের উত্তর খণ্ডে উল্লিখিত কুমারী স্তবের শেষাংশে স্পষ্টত উল্লেখ আছে যে, নিত্য কুমারীর স্তব পাঠ করলে সর্ব বাধা মুক্ত হয়ে পাঠকের মহাবিদ্যা চরণপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত। ভক্তি সহকারে কুমারী পূজা সম্পাদন মাধ্যম কুমারীর প্রীতিলাভ বিশেষ প্রয়োজন ও আশু লক্ষ্য। কুমারী প্রীতা হলে তিনিও প্রতি অর্চনা করেন কিন্তু তাঁকে অবজ্ঞা করলে অবজ্ঞাকারীকে কুমারী ভস্মীভূত করেন। শুধুমাত্র শারদীয়া বা মাধবীয়া (বাসন্তী পূজা) নয়, কুমারী পূজার প্রয়োগ প্রায় সর্বত্রই চোখে পড়ে বিশেষত শক্তিপীঠগুলিতে। আসাম রাজ্যের নীল পর্বতস্থিত দেবী কামাখ্যার মন্দির প্রাঙ্গণ অম্বুবাচী যোগে তো বটেই, বছরের অন্যান্য সময়েও কুমারী পূজার সাক্ষ্য বহন করে। পাশাপাশি কালীঘাট সহ অন্যান্য সতীপীঠেও কুমারী পূজা বিশেষ তিথিযোগে সম্পন্ন হয়। পুরশ্চরণ কর্মে কুমারী পূজা ও কুমারী ভোজন এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ তন্ত্রসাধকের কাছে। মূলত শুক্লপক্ষ কুমারী পূজার উৎকৃষ্ট পক্ষ হলেও কৃষ্ণপক্ষেও কুমারী পূজা শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম নয়। তন্ত্রোক্ত কুমারী পূজায় পৃথক ধ্যানমন্ত্র, আবরণ দেবতাগণ, স্তব, কবচ এবং ভৈরব রূপে বালভৈরবের পূজার বিধান লক্ষ করা যায়। তবে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক কুমারী পূজার মধ্যে বৈসাদৃশ্যাপেক্ষা সাদৃশ্য অধিক লক্ষণীয়।

মহাকাল সংহিতোক্ত কুমারী পূজা : অনন্ত সংখ্যক তন্ত্রের মধ্যে অন্যতম হল মহাকাল সংহিতা যা বিষ্ণু-ক্রান্তায় তন্ত্রোক্ত সংস্কারপ্রাপ্ত সাধকগণের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ ও পালনীয় তন্ত্র। উপরে উল্লেখিত যামলোক্ত কুমারী পূজার সাথে মহাকাল সংহিতায় নির্দেশিত কুমারী পূজার বিধান প্রায় অনেকাংশেই পৃথক। মহাকাল সংহিতায় কুমারী পূজায় মন্ত্রের প্রাধান্য যথেষ্ট বেশি এবং এমনকি মণ্ডপে কুমারী দেবীর আগমন, পাদ্য জল দ্বারা তার চরণ ধৌতকরণ, মণ্ডপে প্রবেশ, মণ্ডলে প্রবেশ এবং আসনে উপবেশন অবধি নির্দিষ্ট মন্ত্রপাঠ সহ প্রতিটি কার্য সম্পাদন করা বাধ্যতামূলক। ধ্যান ও আবরণ দেবতাগণের পার্থক্য ব্যতীত অপর বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলী সমূহ হল কুমারী দেবী আসনে উপবেশন করলে তাঁর উদ্দেশে কারণ সহযোগে সামিষান্ন বলি নিবেদন করা হয় এবং কুমারীর শ্রীঅঙ্গে বিভিন্ন প্রকার ন্যাস করত কুমারী দেবীকে গুহ্য কালিকা চিন্তনে পূজা করা হয়। এতদ্ব্যতীত কুমারীর অঙ্গে অদ্যা, জয়া প্রমুখ আবরণ দেবতাগণের পূজা অক্ষত দ্বারা করা হয়। দেবীকে অন্নভোগ নিবেদনের মন্ত্র ও প্রণালী প্রচলিত বিধি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ষোড়শ উপচার নিবেদনের ক্ষেত্রে নৈবেদ্য, পানার্থোদক প্রভৃতি নিবেদনের পর মাল্য নিবেদন করা হয়। শুধুমাত্র মন্ত্রের আধিক্য নয়, কুমারী দেবীর মণ্ডপে আগমন, প্রীতিপূর্ণ চিত্তে পূজা গ্রহণ এবং পূজা গ্রহণান্তে প্রসন্ন চিত্তে বিদায় অবধি সাধক সদা সচেষ্ট থাকেন যেন দেবীপূজায় কোনোরূপ সেবাপরাধ না ঘটে।

সুবাসিনী পূজা : বাহ্য পূজা ও সাধনা উভয়ই ঈশ্বরমুখী মানুষকে ঈশ্বরের সমীপে পৌঁছে দেয় সত্য কিন্তু বাহ্যপূজানুষ্ঠান এবং সাধনা দুটি সম্পূর্ণ পৃথক পথ। বাহ্য পূজা সর্বসম্মুখে সম্পন্ন হলেও প্রকৃত সাধক সাধনা করেন নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে। কুমারী পূজার মাধ্যমে চিন্ময়ী তনুতে ভগবতী অর্চনার যে পথ চলা শুরু হয় সেই পথের অন্তে হয় সুবাসিনী পূজা।

বহুলপ্রচলিত না হলেও বঙ্গদেশের কোনো কোনো ঐতিহ্যবাহী পরিবারে দুর্গোৎসবের সময় আজও এই পূজার প্রচলন বিদ্যমান। মূলত অনূর্ধ্বা ৩০ বছরের বিবাহিতা স্ত্রীলোককে এই পূজায় দেবীরূপে বরণ করা হয় এবং খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে যথাসাধ্য উপচারে সাধক নিজ ইষ্টদেবী বা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীকে অর্চনা করেন নির্বাচিতা দীক্ষিতা নারীকলেবরে। তবে অনেক ক্ষেত্রে সাধক নিজ শক্তিতে (অর্থাৎ নিজ ধর্মপত্নীর দেহে) এই পূজা সম্পাদন করেন। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ বিরচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে'র বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বিখ্যাত মাতৃসাধক গৌরী পণ্ডিত প্রতি বছর শারদীয়া পূজাকালে আপন স্ত্রীর শরীরে চিন্ময়ীরূপে মহাদেবীর পূজা করতেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যে ষোড়শী পূজা করেছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের ভগবতী তনুতে তা আজ বহুজন চর্চিত এবং এ পূজা সুবাসিনী পূজা ব্যতীত অপর কিছুই নয়। এই পূজা অন্তে ঠাকুর যেমন তাঁর সাধনলব্ধ সমস্ত ফল দেবীর চরণে সমর্পণ করে ভেদ দূর করেছিলেন সাধ্যা ও সাধকের, ঠিক তেমনি প্রকৃত কৌল সাধক এই সুবাসিনী পূজার মাধ্যমে ইষ্টদেবীর সাথে যোগ স্থাপন মাধ্যম একীভূত হতে পারেন। তন্ত্রসার গ্রন্থে এই সাধনাকে লতা সাধনা নামে অভিহিত করা হয়েছে। জন্মদানকালে মাতা, স্নেহকালে কন্যা, যৌবনে যিনি ভার্যা তিনি অন্তিমকালে মোক্ষদায়িনী কালী এই ব্যাখ্যা সত্য রূপে প্রতিপাদিত হয় সুবাসিনী পূজার মধ্য দিয়ে। বঙ্গদেশে বা বহিঃবঙ্গে কুমারী পূজার ন্যায় সুবাসিনী পূজার বিস্তৃত পদ্ধতি, ধ্যান, স্তব, কবচ প্রভৃতি সহজলভ্য না হলেও গুরুনির্দেশ, গুরু-আশিস এবং গুরুকৃপায় সাধক সম্পাদন করেন এই পূজা এবং দেবীর কৃপায় মুক্ত হয় সাধকের মুক্তির দ্বার।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহাঋষি মেধা রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যকে বলেন যে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনতা প্রভৃতি মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী সকলের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু ঈশ্বর প্রেমময়তা ও ধর্মবোধ শুধু মানুষের চিত্তে বিরাজমান। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল মহামায়ার মায়া প্রভাবে অধিকাংশ জীব থাকে পার্থিব বিষয়বস্তুর মোহে মোহাচ্ছন্ন এবং নিত্য-অনিত্য বস্তুর মধ্যে পার্থক্যকরণে হয় ব্যর্থ। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিত্য বস্তু (অর্থাৎ ঈশ্বর) ত্যাগ করে অনিত্য বস্তুর (অর্থ, ধন, মান, যশ, প্রতিপত্তি, পুত্র-পৌত্র) মোহে তারা সুখে কালযাপন মাধ্যম ব্যর্থ করে তাদের দুর্লভ মনুষ্য জীবন। পার্থিব সুখে মোহাচ্ছন্ন মানুষ ক্রমশ জড়িয়ে পড়ে ভোগলিপ্সায় এবং শিকার হয় ক্রমআসক্তির। ত্রিতাপ দুঃখ যেন অচল পর্বতের ন্যায় অপ্রতিরোধ্য রূপে দণ্ডায়মান হয় তাদের জীবনে। মৃত্যু ব্যতীত কোনো উপায় থাকে না ত্রাণলাভের। শ্রীশ্রীসারদামণি বলেছেন যে, সম্পূর্ণ নির্বাসনা না হলে মুক্তিলাভ কখনোই সম্ভব নয়। সুতরাং সংসারক্লিষ্ট হলেও খুব কম সংখ্যক মানুষ মহামায়ার কৃপায় নির্বাসনা হয়ে দেহত্যাগ করে মুক্তিলাভ করে। গভীর অনুসন্ধান করলে লব্ধ সত্য প্রমাণিত হয় যে সকল দুঃখের মূল কারণ নিহিত থাকে কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি আসক্তির মধ্যে। নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ অলঙ্ঘনীয়; ঘৃণা, ক্রোধ প্রভৃতির দ্বারা কোনোরূপে তা দূরীভূত করা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু এই দূরতিক্রম্য কর্মকে সহজলভ্য করে দিয়েছে তন্ত্রশাস্ত্র যেখানে ঘৃণা অথবা ভোগ্যবস্তুর পরিবর্তে নারী স্থান পেয়েছে জননীর আসনে। কামিনীকে জায়ার পরিবর্তে জননীরূপে পরিণতি করণের মধ্য দিয়ে সাধকের ঘটে আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং দুর্গম পথ হয়ে ওঠে সুগম। প্রকৃত সাধক সর্বদাই যে কোনো রমণীকে জননী জ্ঞানে দর্শন করেন কামাসক্ত দৃষ্টির পরিবর্তে ভক্তি সমন্বিত দৃষ্টিতে; আনন্দময়ী জগন্মাতার ভিন্ন রূপের প্রকাশ রূপে প্রতীয়মান হয় প্রতিটি রমণী প্রকৃত সাধকের দৃষ্টিতে।

একবিংশ শতাব্দীর ভোগবিলাসে মত্ত একশ্রেণির মানুষের কাছে আজ শাস্ত্রসমূহ সম্পূর্ণ ব্রাত্য; ঋষি মহাঋষিদের দিব্যদৃষ্টিতে দৃশ্যগোচর সত্যসমূহ আজ তাদের চোখে অর্থহীন। তথাকথিত আক্ষরিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত এই সকল মানুষ হয়তো আধাত্মিকতার মূল অর্থ ও মূল্য অনুধাবন করতে না পারায় আধ্যাত্মিতার নামে ব্যঙ্গ হাসি প্রদর্শন করে তাদের ঠোঁটের কোণায়। কিন্তু একথা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই যে যষ্টি ব্যতীত যেমন খঞ্জ ব্যক্তি গমনে অক্ষম, অবলম্বন ব্যতীত লতানো গাছের আরোহণ অসম্ভব ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিকতা ব্যতীত কোনো মানুষের প্রকৃত উত্তরণ তথা এই মায়াময় সংসারে সন্তরণপূর্বক তাকে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিকতার উচ্চ স্তরে পৌঁছনোর জন্য যে সকল সোপান অতিক্রম করতে হয় তন্মধ্যে সরলতা, শুদ্ধ মানসিকতা প্রভৃতি গুণাবলী বিশেষ প্রয়োজন এবং দৃঢ়তার সাথে এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে বাহ্যপূজা যখন অন্তরের নির্মলতা রূপ চন্দন দ্বারা চর্চিত হয়ে দেবচরণে উৎসর্গীকৃত হয় তখন আধ্যাত্মিক উত্তোলন অবশ্যম্ভাবী, অবশ্যম্ভাবী কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ। বাহ্যপূজা মাধ্যম অন্তরশক্তির জাগরণ ঘটাতে পারলে সার্থক হবে মনুষ্য জীবন, ধন্য হবে আমাদের সকল কর্ম, সফল হবে সকল প্রয়াস।

বহির্বঙ্গে নানা রূপে দেবী দুর্গা

চৈতন্যময় নন্দ

মা মঙ্গলা : কোনারক থেকে ভুবনেশ্বরের দিকে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে তারপর সোজা বাঁদিকের রাস্তায় ঢুকে হাঁটতে হবে কিছুক্ষণ। গ্রামের নাম কাকতপুর। এখানে এক প্রাচীন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা মা মঙ্গলা। ওড়িশার আপামর জনসাধারণ এই বৈষ্ণবী শক্তিকে শ্রীজগন্নাথদেবের জননী হিসেবে বরণ করে নিয়েছেন প্রাচীনকাল থেকে। মঙ্গলাদেবী নিম্ন, উচ্চ সব বর্ণের মানুষদের কাছে সমানাংশে প্রাণপ্রিয়া। শবরদের তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবী। অর্ধপদ্মাসনা এই চতুর্ভুজা প্রস্তর প্রতিমার পরনে রক্তবস্ত্র, অঙ্গে বহুমূল্য অলংকার। দেবীর মস্তকে মুকুট একটি নয়, দুটি। একটি রুপোর, আরেকটি সোনার। সর্বমঙ্গলা ত্রিলোচনা। এই রাজরাজেশ্বরীর এক হাতে পূর্ণ চন্দ্র, এক হাতে পদ্মকুঁড়ি, এক হাতে জপমালা আর এক হাতে শঙ্খমালা শোভিত। দেবীর পাদদেশে বিরাজিত তিনটি মূর্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের। সারা বছর মঙ্গলা মায়ের আরাধনা বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে সম্পাদিত হয়। সমস্ত রকমের আমিষ এখানে বর্জিত। সাধারণত বারো বছর অন্তর জগন্নাথদেবের নবকলেবরের জন্য যে দারুবৃক্ষ নির্বাচন করা হয়, তাতে যাতে নির্বিঘ্নে দারুমূর্তি গড়ে পুরুষোত্তমের অর্চনা করা যায়, সেজন্য পুরীর পতিমহাপাত্র ও দ্বৈতাপতিরা মঙ্গলা মন্দিরে এসে দেবীমায়ের কাছে ধরনা দেন। পুরী থেকে মহাপ্রসাদ ও বস্ত্র দেবীর জন্য এঁরা সঙ্গে নিয়ে আসেন। প্রথমে দেবীকে অভিষেক করানোর পরে তাঁকে ষোড়শোপচারে পুজো দিয়ে রত্নালংকারে ভূষিত করা হয়। সেইসময় চারজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ দুর্গা সপ্তশতী পাঠ করতে থাকেন। তখন দেবীমূর্তিকে নানাবিধ ফুলে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে দেওয়া হয়।

ভদ্রকালী : মহাভারতের মহাসমরের স্থান হিসেবে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র নামে চিহ্নিত। ভগবান পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ এ স্থানেই গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন। এটি অতি প্রাচীন পবিত্র তীর্থ।

কুরুক্ষেত্রের বিবরণ মহাভারতের নানা স্থানে উল্লিখিত। সুপ্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্রে এই তীর্থ একান্নপীঠের অন্যতম এক মহাপীঠরূপে বিঘোষিত। আদ্যাশক্তি মহামায়া সতীদেবীর ডান পায়ের গোড়ালি এখানে পতিত হয়েছিল। এ স্থানে পীঠদেবীর নাম ভদ্রকালী এবং ভৈরব হলেন অশ্বনাথ। আদ্যাস্তোত্রে আছে, 'কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী, ব্রজে কাত্যায়নী পরা।' মহামেঘ বরণা, চতুর্ভুজা ত্রিনয়না, নানা অলংকারে শোভিত এই মহাদেবী রক্তবস্ত্র পরিহিতা। হরমনোরমার বামদিকের দু'হাতে ত্রিশূল ও মুণ্ডমালা এবং দক্ষিণ দিকের দু'হাতে বরাভয় ও রুদ্রাক্ষ।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, এই দেবীতীর্থে এসে মা যশোদা ও নন্দরাজা নবরাত্রিতে বালক শ্রীকৃষ্ণের মুণ্ডন সংস্কার করেছিলেন। আবার মহাভারতে দেখি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে ভগবান বাসুদেব উপদেশ দিয়েছিলেন পরন্তপ অর্জুনকে দুর্গাস্তব করার জন্য। 'পরাজয়ায় শত্রুনাং দুর্গাস্তোত্র মুদীরয়।' শরণাগত তৃতীয় পাণ্ডব শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে শত্রুজয়ের ইচ্ছায় এই পীঠভূমিতে এসে নতজানু হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে জগন্মাতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে দনুজদলনী দুর্গার স্তব করেছিলেন দেবীকে নানা বিশেষণে বিশেষিত করে।

মহামায়াকে প্রসন্ন করতে তাঁর শ্রীচরণে অর্পণ করেছিলেন কয়েকটি অশ্ব। আজও নবরাত্রি, দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসেন মাহাত্ম্যের এত দুর্নিবার আকর্ষণে। সেইসঙ্গে প্রসন্নময়ী ভগবতীকে তৃপ্ত করতে সঙ্গে নিয়ে আসেন পোড়ামাটির ঘোড়া। এই পরাশক্তির কাছে শারদীয়া উৎসবের সময় বিশেষ পুজো-বিধি অনুষ্ঠিত হয়।

লেখক—বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গ্রন্থকার।

● কুরুক্ষেত্রে ভদ্রাকালী।

অম্বাদেবী : গুজরাতে দেবী দুর্গা পূজিতা 'অম্বা' 'হিঙ্গলা' ও 'রুদ্রাণী' নামে। অর্বুদগিরি শৈলমালার ওপরে বিদ্যমান অম্বাদেবীর শ্বেতপাথরের সুউচ্চ দর্শনীয় মন্দির। কথিত আছে এটিও একটি মহাপীঠ। মন্দিরের সম্মুখে বিশাল চৌহদ্দি। পিছনে দৃশ্যমান রমণীয় সরোবর। ভক্তরা এই পুষ্করিণীতে স্নান সেরে দেবীর পুজো দিতে আসেন। অম্বাদেবীর অষ্টভূজা মূর্তি নানা অলংকারে শোভিতা। নবরাত্রে এই অপরূপা দেবীর সামনে মন্দির প্রাঙ্গণে হয় সুবিখ্যাত নিরুপম খরবা নাচ। চলে বিজয়া দশমী পর্যন্ত। উৎসবের ক'দিন মন্দিরে হয় মায়ের বিশেষ অঙ্গরাগ ও নানাবিধ দ্রব্য সহকারে ভোগদান। দেবীসূক্ত, রাত্রিসূক্ত, শ্রীসূক্ত ও সপ্তশতী মহাস্তোত্র দৈনিক পঠিত হয়। এখানে নবরাত্রির বিশেষ অঙ্গ প্রতিদিন সকালে তিলক দান। হলুদ ও সিঁদুরকে তেলে গুলে নিয়ে প্রত্যেকের মধ্যে তিলক আদানপ্রদান হয়। এ সময় মেয়েরা অম্বাজির কাছে আসেন নতুন বস্ত্র, তিলকধারণ ও টিকলি পরে।

গুজরাতে এই অম্বাজির অবস্থান বহু স্থানে। সুউচ্চ গিরনার পর্বতে দেখি এই চিন্ময়ী মহাশক্তিকে। আর এখানে আছে দত্তাত্রেয়, গোরক্ষনাথ ও নৈমিনাথের মন্দির। উল্লেখ্য, এই দুর্গম স্থানে সুদীর্ঘ চড়াই অতিক্রম করে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যখন মন্দিরগুলির দর্শনে আসেন, তখন পথ পরিক্রমায় যেতে যেতে দেখলেন এক বৃদ্ধ সাধু মাতৃমন্দিরের সম্মুখের রাস্তায় পীড়িত হয়ে অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। সাধুর এই করুণ অবস্থা দেখে পরদুঃখ কাতর মহাপ্রভু ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। নিজহাতে শুশ্রূষা ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা করে স্নেহের পরশে সেই সাধুকে অচিরেই ব্যাধিমুক্ত করালেন।

দেবী বিন্ধ্যবাসিনী : এলাহাবাদ কিংবা বারাণসীর অনতিদূরে বিন্ধ্যাচল। মহাবিদ্যা মহামায়া এখানে দেবী বিন্ধ্যবাসিনীরূপে কীর্তিতা হয়ে অনন্তকাল ধরে আরাধিতা। দেবীর ভৈরব হচ্ছেন পুণ্যভাজন। একটি ছোট পাহাড়ের উপর সুশোভন মন্দিরে দেবীর ভদ্রাসন। কষ্টিপাথরে নির্মিত এক সর্বেশ্বরী সিংহবাহিনী পূজিতা অষ্টভুজা মূর্তিতে। প্রতি বছর নবরাত্রির সময় দেবীতীর্থ বিন্ধ্যাচল হয়ে ওঠে মায়ের জয়গানে মুখরিত। এই সময় দেবীর সামনে বলিদান হয় শত শত। জনশ্রুতি, আগে এই তান্ত্রিক পীঠে ছিল ভয়ঙ্কর সব আচার-অনুষ্ঠান। আর আছে প্রচলিত বহু লোকাচার। মনস্কাম সিদ্ধির জন্য দেবীর কাছে অনেক আগে একাধিক নরবলিও হত। শারদোৎসবে বিন্ধ্যাচলবাসীর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও ভক্তি আজও অটুট। এখন পুজোর দিনগুলিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হাজার হাজার গৃহ দুর্গার সিন্দুর, আলতা, নারকেল, লাল জরির শাড়ি, অর্ঘ্যের ডালা এক ব্যতিক্রমী আকর্ষণ হয়ে উঠেছে।

নয়নাদেবী : পাঞ্জাবের আনন্দপুর সাহিবের কাছে পর্বতের অরণ্যের নির্জন পরিবেশে দেবী নয়নার মন্দির অবস্থিত। পীঠাধিষ্ঠাত্রী পরমা প্রকৃতি নয়নাদেবীর নামেই এই অঞ্চল নয়না পর্বত নামে খ্যাত। দশম ও শেষ শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল একমাত্র জগদম্বা চণ্ডিকার আশিসেই শত্রুজয় সম্ভব। সিদ্ধিদাত্রী ভয়ঙ্করা দেবী নয়না দুর্গার বিবিধ উপচারে আরাধনা করে গুরুগোবিন্দ সিদ্ধকাম হয়ে সাহসিকতা ও বীর্যবত্তার ক্ষেত্রে এক আদর্শ দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন। কথিত আছে, দেবীসূক্তের মন্ত্রে হোম-যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দেওয়ার সময় অগ্নির লেলিহান শিখার মধ্যে তরবারি হস্তে মহাশক্তি নয়নাদেবী আবির্ভূতা হয়েছিলেন। অনেকের মতে গুরু গোবিন্দের কৃপায় সেই শত্রুদলনী মহাশক্তিরই প্রতীক।

যাজপুর : বৈতরণী নদীর তীরে বিরাজমান এই আদি যুগের সদরটি শক্তিসাধনার অন্যতম মর্মস্থল হিসাবে আজও প্রমাণীকৃত। এখানকার পীঠস্থানের অধিষ্ঠাতা জগন্মাতা শ্রীশ্রীবিরজাদেবী। এই আদ্যাশক্তি মহাদেবী দ্বিভুজা মূর্তিতে অনন্তকাল বিরাজিত। তিনি সিংহবাহিনী ও অসুরদলনী। 'বিরজা ঔড্রদেশে চ' এই শাস্ত্রবাক্য চলে আসছে শত শত বৎসর ধরে। এক পৌরাণিক উপাখ্যানে বিবৃত আছে প্রজাপতি ব্রহ্মা এই মুলুকে এসে প্রথম এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেই হবনের প্রভাবে হোমাগ্নি থেকেই দেবী বিরজার অভ্যাগমন। বৈতরণীর তটভূমিতে বিরজা পুণ্যধামে পাণ্ডবদের উপস্থিতির বয়ান মহাভারতের বনপর্বে উল্লেখিত। কেবলমাত্র মহাভারত কেন, বিভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র বিরজাক্ষেত্র প্রসঙ্গে মধুর বর্ণনা করেছে। দেবী ভাগবত, কপিল পুরাণ, ব্রহ্মপুরাণে বিরজার বিবরণ ব্যাখ্যাত। কুব্জিকাতন্ত্র, বৃহন্মীল তন্ত্র, জ্ঞানার্ণব তন্ত্র ইত্যাদিতে বিরজাভূমির বিদ্ঘোষণ অনন্য মহাপীঠ রূপে।

উল্লেখ্য নীলাচল যাত্রার পথে শ্রীচৈতন্যদেব এই দেবী মন্দিরে এসে ভগবতী দুর্গার নয়নশোভন মূর্তি দর্শন করে কৃষ্ণভক্তি লাভের কামনায় স্তব, নামগানের মাধ্যমে এই সর্বাভিষ্টদায়িনীর ভজনা করেছিলেন। বৈষ্ণব কবি শ্রীলোচনদাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে আছে—

আনন্দ হৃদয় যায় বিরজা দেখিতে।
বিরজা মহিমা কেবা পারয়ে কহিতে।।
কোটি কোটি পাতক নাশয়ে দরশনে।
বিরজা দেখিয়া প্রভু হরষিত মনে।।
বিরজাকে নমস্করি কহিল বচনে।
দেহ প্রেমিভক্তি মোরে কৃষ্ণের চরণে।।

দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয় মূর্তি তারাদেবীরও অনন্যতার বিশ্রুতি যাজপুরের আশপাশে। তারামায়ের আর এক রূপ কুরুকুল্লা তারার ভদ্রাসন বিভিন্ন পল্লীতে। বৈশিষ্ট্যের অভিনবত্বে এই দেবীর উন্মেষ বৌদ্ধতন্ত্রে। শক্তি আরাধনার বিস্তার এখানে যে কতখানি তার নজির মেলে সপ্তমাতৃকার আদ্যিকালের উপস্থিতিতে। মহামায়ার ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিকীর্তিতা দেবীপ্রতিমাগুলি যথাক্রমে ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী ও ঐন্দ্রী। দুর্গাসপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত বিরজাক্ষেত্রে মহাসমারোহে দুর্গাপূজার পর্ব সুসম্পন্ন হয়। উৎসবের এই মহাতীর্থে শত শত নরনারীর সমাগম এক অন্যরূপ ধারণ করে।

বিমলাদেবী : ভারতবর্ষে যে চারটি প্রসিদ্ধ ধামের উল্লেখ আমরা পাই তার মধ্যে অন্যতম পুরীর জগন্নাথ ধাম। নীলাচলে লবণ সমুদ্রের তীরে এটি পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বলে পরিগণিত। শ্রীক্ষেত্রের অপার মহিমা। পবিত্র একান্ন মহাপীঠের অন্যতম পুরীধাম। দেবী এখানে বিমলারূপে বিরাজিতা। আদ্যাশক্তি মহামায়া সতীদেবীর নাভিদেশ এখানে ঝরিত হয়েছিল। এজন্য শ্রীক্ষেত্রের অন্য নাম নাভিক্ষেত্র। দেবীর সহযোগী হিসাবে স্বয়ং মহাবিষ্ণু জগন্নাথদেব এখানে ভৈরবরূপে অবস্থান করছেন। প্রাণতোষিণী তন্ত্রে দেখতে পাই 'উৎকল নাভিদেশশ্চ বিরজা ক্ষেত্রমুচ্যতে। বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ।' আবার এ তীর্থের নামও বিরজা ক্ষেত্র। দেবী ভাগবতে আছে পুরীতে দেবীর দুটি চরণ পতিত হয়েছিল। সেইহেতু এই স্থান পাদপীঠ হিসাবেও আখ্যায়িত। মৎস্য পুরাণের বচন, মা বিমলা অষ্টশক্তির অন্যতমা। বিখ্যাত আদ্যাস্তোত্রেও দেবী বিমলা দৃপ্তকণ্ঠে বিদ্ঘোষিতা। 'বিমলা পুরুষোত্তমে।'

এই সর্বেশ্বরী পরমা জননী আরাধিতা চতুর্ভুজা মূর্তিতে দণ্ডায়মানা দেবীর তিন হাতে তিন আয়ুধ যথাক্রমে—ত্রিশূল, খড়্গ, খর্পর এবং আর এক হাতে রুদ্রাক্ষ মালা। কষ্টিপাথরের দ্বারা নির্মিত দেবীমূর্তির তিনটি চোখই সোনার। দেবীর সামীপ্যে দু'পাশে দুটি ছোট মূর্তি ছায়া ও মায়া। পরমভক্তিতে এই সর্বসিদ্ধিদায়িনী মহাবিদ্যা পূজিতা বহু প্রাচীন যুগ থেকেই। জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগেও নৃসিংহদেব ও বিমলা দেবীর মন্দির ছিল প্রাচীনতম। বিচিত্র বেশভূষা, শাঁখা, আলতা, সিন্দুরদান আর ভোগরাগ দেবীর নিত্যপূজার অন্যতম অঙ্গসৌষ্ঠব। শারদীয়া দুর্গাপুজোয় অধিষ্ঠিতা এই মহামাতার বিশেষ পূজা-অর্চনা চলে মহা সমারোহে। ষোলো দিন ধরে দেবীর ষোড়শোপচারে পুজো বিধিমত সম্পন্ন হয়। এক এক দিনে আকর্ষণীয় বেশ নানারূপে পরিদৃষ্ট হয়। যেমন বনদুর্গা, জয়দুর্গা, শূলীদুর্গা, বগলা, নারায়ণী, হরচণ্ডী, রাজরাজেশ্বরী প্রভৃতি বেশ প্রকাশিত। শারদ-মহাষ্টমী ও মহানবমীর মধ্যরাত্রে সম্পাদিত রহস্য পুজো রীতিসিদ্ধ। মহানিশায় দুটি করে মেষবলি ও আমিষভোগ শাক্ত আচারে নিবেদিত হয় বিমলা মায়ের মনোবাঞ্ছায়।

এই রহস্য পুজোর সময় মন্দিরের পুরোহিতরা থাকেন না। জগন্নাথদেবের মন্দিরের সব দ্বার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তবেই শুরু হয় এই দেবীর তান্ত্রিক পুজোর সব বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠান। সে সময় কারও প্রবেশাধিকার থাকে না। উষালগ্নের আগেই এই মহাপুজো উদযাপিত করতে হয়। তান্ত্রিক পূজারি চলে যাওয়ার পরই দারুব্রহ্ম জগন্নাথের মন্দিরের সমস্ত দরজা উন্মুক্ত হয়। শ্রীক্ষেত্রের এই মহাদেবী তীর্থের এত অসাধারণত্ব ও সমন্বয় ধর্মিতায় সুগ্রথিতা।

ওড়িশার মহাকবি সারদা দাস ভগবতী বিমলাদেবীর বন্দনা করে তাঁকে পরম বৈষ্ণবী ও মহাসরস্বতী রূপে উদ্ধৃত করেছেন এই বলে—

'জয় জয় শারদা গো বিষ্ণুর বল্লভী।
জয় জয় শারদা গো পরম বৈষ্ণবী।।'

দেবী কামাক্ষী : দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীপুরম কাঞ্চী নামে প্রসিদ্ধ। মহামায়া সতীদেবীর কঙ্কাল এখানে পতিত হওয়ায় নাম হয়েছে কাঞ্চী। একান্ন পীঠের অন্যতম এ স্থানে অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন কামাক্ষী এবং শিবের নাম একাম্রনাথ। পৃথিবী লিঙ্গরূপে তিনি পূজিত হন। বহু মন্দিরাদি পরিপূর্ণ এই পবিত্র দেবীতীর্থের মাহাত্ম্য প্রকট। ভারতের সাতটি মোক্ষদায়ক মহাতীর্থের মধ্যে কাঞ্চীপুরম অন্যতম। অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা। কাঞ্চীপুরম শহরটি দুই ভাগে পৃথক নামে পরিচিত। একটি শিবকাঞ্চী প্রধানাদেবী কামাক্ষীর মন্দির। দক্ষিণ দেশের আপামর জনসাধারণ এই

● দেবী কামাক্ষী। আসাম।

মহাশক্তিকে বরণ করে নিয়েছেন বহু প্রাচীনকাল থেকে।

মন্দিরের গর্ভগৃহে পদ্মাসনে আসীনা ত্রিলোচনা রাজরাজেশ্বরী কামাক্ষী মাতা আরাধিতা চতুর্ভুজা মূর্তিতে। তাঁর চার হাতে চার আয়ুধ। যথাক্রমে পাশ, অঙ্কুশ, ধনু ও পুষ্পবাণ। কথিত আছে এই দেবীতীর্থে এসে অর্চনা করে সম্পদ ও শ্রীর অধিষ্ঠাতা দেবী লক্ষ্মী মহাবিষ্ণুর শাপে ভ্রষ্ট তাঁর লুপ্ত সৌন্দর্যকে পুনরায় ফিরে পেয়েছিলেন। দেবী কামাক্ষী মায়ের আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি কৃপা-করুণা প্রকাশ করে ভক্তদের মনোবাসনা পূরণ করেন। তাই এই দেবী 'কামকোটী কামাক্ষী' নামেও আদৃতা। যে মণ্ডপে দেবীমূর্তি স্থাপিত সেই স্থানটি 'গায়ত্রী মণ্ডপম্' নামে অভিহিত। মণ্ডপের ২৪টি অক্ষরের প্রতীক এবং চারটি দেওয়াল চতুর্বেদের প্রতিভূরূপে কথিতা। এই শক্তিস্থল অলংকৃত করে আদি শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীচক্র' পূজিত হয়ে আসছে শত শত বৎসর ধরে।

তুলজা ভবানী : দারিদ্র্য-দুঃখহারিণী রাষ্ট্ররূপিণী দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা 'তুলজা ভবানী' রূপে ছত্রপতি শিবাজির আরাধ্যা হিসাবে প্রকীর্তিতা। মহারাষ্ট্রের শোলাপুর শহর থেকে চুয়াল্লিশ কিলোমিটার দূরে পাওয়া যাবে তুলজা ভবানীর মন্দির। অধিষ্ঠাত্রী এই অপরূপা দেবীর নামানুসারে এই অঞ্চলের নাম তুলজাপুর। মারাঠা জাতির অন্যতম শক্তিপীঠ হিসাবে প্রাচীন এই মন্দিরের খুবই নামডাক। সুউচ্চ স্তূপের তলদেশে দেবদেউল। গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত তিন ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট কষ্টিপাথরের অষ্টভুজা দেবীপ্রতিমা। আলুলায়িতকেশী মহিষাসুরমর্দিনী এই রাজরাজেশ্বরীর পরনে রক্তবস্ত্র, অঙ্গে বহুমূল্য অলংকার। রণরঙ্গিনী ভবানীদেবীর আট হাতে যথাক্রমে ত্রিশূল, ছোরা, বান, চক্র, শঙ্খ, ধনুষ, পানপাত্র ও অসি শোভিত। দেবীর দক্ষিণ পদতলে অসুররাজ মহিষাসুর আর পাশে বাহন পশুরাজ সিংহ। দেবীর শিরোভাগে সূর্য আর চন্দ্র। ডানপাশে তূয়মান শ্রীশ্রীচণ্ডীর বার্তাকার মহর্ষি মার্কণ্ডেয়।

স্কন্দপুরাণে তুলজা ভবানীদেবীর উপস্থিতির শোভন পরিচয় পাই সর্বাগ্রে। কর্দম ঋষি দেহত্যাগ করলে ঋষিপত্নী অনুভূতি সহমরণে আকুলতা দেখালেও শিশুপুত্রের মায়ার বন্ধনে সতী হওয়া থেকে নিজেকে নিবারিত করেন। এরপর সন্ন্যাসিনীর বেশে ঋষিজায়া মন্দাকিনী তলে জগদম্বিকার দর্শনলাভের আশায় নিরাহারী হয়ে সংযত চিত্তে কঠোর তপস্যা শুরু করেন। সেই সাধন প্রক্রিয়ার ফলে দেবী দুর্গা অষ্টভুজা তুলজারূপে আবির্ভূতা হয়ে ঋষিপত্নী অনুভূতিকে দর্শন দানে ধন্য করে তাঁকে আশীর্বাদ প্রদান করেন। স্বল্পকাল পরে এই টিলার পাদদেশে ঋষি গেহিনী অষ্টভুজা সেই দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। যা অনন্তকাল ধরে আরাধিতা। এই মাতৃমন্দিরে হরমনোমোহিনী ভবানীর নিত্য ত্রিসন্ধ্যা বিবিধ উপচারে পুজো ও হোম হয়ে থাকে। এখানে পুজোর আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে আছে অনেক বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী দৈনিক শত শত দর্শনার্থী দূর-দূরান্ত থেকে আসে ভক্তি সহকারে এই চিরজাগ্রতা দেবীকে পুজো নিবেদন করতে। শারদীয় নবরাত্র ও দুর্গোৎসব এলেই এই দেবীতীর্থ যেন বেশি করে জেগে ওঠে। তখন মহাধূমধামের সঙ্গে এই চিন্ময়ী মহাশক্তির আরাধনা হয়। মহাষ্টমীতে ভবানীদুর্গার কাছে প্রচুর ছাগবলি প্রদান চণ্ডীয়ং ও লাল ভোগলার তরকারি (মিষ্টি কুমড়ো) আর এক ব্যতিক্রমী আকর্ষণ। মন্দির প্রাঙ্গণে বসে বিরাট মেলা। লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগমে তুলজাপুর হয়ে ওঠে মা ভবানীর জয়গানে মুখরিত। গ্রাম-শহর হতে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, শিশু-বৃদ্ধ সর্বস্তরের মানুষ শোভাযাত্রা করে তুলজা ভবানীর ছবি মাথায় করে বা পালকিতে নিয়ে এসে গান করতে করতে সমবেত হন দেবী মন্দিরে। অনেকের মতে এই সংগঠিত শোভাযাত্রার প্রবর্তক হলেন সুধীর শিবাজি স্বয়ং। ভবানী মন্দিরের বাইরে রয়েছে শিবমন্দির। এখানে ভৈরব ভবানীশঙ্কর নামে পরিচিত। সমগ্র মারাঠা জাতির মনে আজও বিশ্বাস রয়েছে যে, ছত্রপতির সংকল্প বাস্তবায়নে তুলজা ভবানী মা স্বয়ং প্রকটিত হয়ে একখানা তরোয়াল প্রদান করে তাঁকে শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন।

দেবী কাত্যায়নী : রসিকেন্দ্রমৌলি শ্রীনন্দনন্দন এবং মহাভাবের ঘনীভূত মূর্ত শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর নিত্যলীলা ভূমি শ্রীবৃন্দাবন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতি খণ্ড থেকে জানা যায়, গোলকবিহারী শ্যামচাঁদই বৃন্দাবনের রাসমণ্ডলে সর্বপ্রথম ভগবতী দুর্গার আরাধনা শুরু করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে এই ব্রজধাম একান্ন পীঠের অন্যতম এক মহাপীঠরূপে ঘোষিত। আদ্যাশক্তি মহামায়া সতীদেবীর কেশজাল এখানে পতিত হয়েছিল। দেবীদুর্গা বৃন্দাবনে বিরাজিতা কাত্যায়নী রূপে। এ স্থানের ভৈরব হলেন ভূতেশ। ঋষি কাত্যায়ন বহু বছর ধরে দুর্গার তপস্যায় রত ছিলেন। তাঁর একমাত্র প্রার্থনা ছিল এই মহাদেবী যেন তাঁর গৃহে কন্যারূপে আবির্ভূতা হন। মা এই ইচ্ছা মেনে নিয়ে মহর্ষির পুজো গ্রহণ করেছিলেন। কাত্যায়ন মুনি এঁর অর্চনা করেছিলেন বলে দেবী অভিহিতা কাত্যায়নী রূপে।

বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর অন্যতম আচার্য শ্রীজীব গোস্বামী

শ্রীশ্রীকাত্যায়নী দুর্গামাতাকে বৈষ্ণবী শক্তি বলে অভিহিত করেছেন। ব্রজাঙ্গনাগণ ব্রজসুন্দর স্বয়ং ভগবানকে পতিরূপে লাভ করার উদ্দেশ্যে সর্বকামবরেশ্বরী সিংহস্থা কাত্যায়নী দেবীর নানা উপচারে অর্চনা করে হেমন্ত ঋতুতে এক মাস ধরে বিবিধ নিয়মে ব্রত পালন করেছিলেন। কৃষ্ণপ্রাপ্তি কামনায় ব্রজবল্লবীগণের দেবীপুজোর মন্ত্র ভক্তিশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতে পরিপুষ্ট বা বিকশিত।

হে মহামায়া কাত্যায়নী, তুমি মহাযোগিনী শ্রেষ্ঠা, তোমাকে নমস্কার করি। নন্দগোপের পুত্রকে তুমি পতিরূপে লাভ করিয়া দাও। গোপকুমারীগণের একমাস কাল কঠোর ব্রতকে স্মরণ করে এই প্রেমভূমি বৃন্দাবনে বিশেষত ব্রজাঙ্গনাগণ আজও এক মাস কাত্যায়নী ব্রতের অনুষ্ঠান করে থাকেন।

কাশীর দুর্গা : সর্বতীর্থময় বারাণসীধাম শৈবতীর্থ হিসাবে পরিচিত হলেও শক্তিদেবীর অধিষ্ঠানক্ষেত্র রূপে বিশেষভাবে চিহ্নিত। এখানে দেবীবন্দনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে মন্দিরে মন্দিরে। কাশীর অধিষ্ঠায়ক বাবা বিশ্বনাথের পাশেই রয়েছেন 'ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী' 'ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী' মাতা অন্নপূর্ণা। দেবীর মন্দির ও মূর্তি এমনই একটা প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত যা সহজেই সকলের নজরে কাড়ে। অন্নদা অন্নপূর্ণাকে এখানে দেখি পদ্মাসীনা দ্বিভুজা রূপে। নবরাত্রি উৎসব ছাড়াও প্রতি বছর কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদে আয়োজিত হয় মহাসমারোহে অন্নকূট উৎসব। ওইদিন সমাগত ভক্তজনের দর্শন ও প্রণামের জন্য দেবীমাতৃকার সুবর্ণমণ্ডিত আদি মূর্তিটি মন্দিরে এনে রাখা হয়।

বরাভয়কারী ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা ছাড়া বারাণসীতে নবদুর্গারও সমধিক প্রসিদ্ধি। এঁদের পাওয়া যাবে বিভিন্ন মন্দিরে। এসব দেবীপ্রতিমা হল শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, মহাগৌরী ও সিদ্ধিদাত্রী। উল্লেখ্য বারাণসী একান্ন পীঠেরও অন্যতম একটি পীঠ। দেবীর মণিময় কুণ্ডল যেখানে পড়েছিল, সেই অতি পবিত্র স্থানটি 'মণিকর্ণিকা ঘাট' নামে সুপ্রতীত। দিব্য দীপ্তিমালিনী জ্যোতির্ময়ী দুর্গামাতা এখানে বিশালাক্ষী নামে উপস্থিত। শিবের অবস্থান এখানে কালভৈরব নামে। তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, রক্তবস্ত্রপরিহিতা, মুণ্ডমালা শোভিতা দ্বিভুজা বিশালাক্ষী দেবী অপূর্ব লাবণ্যময়ী ও সদাপ্রসন্না। মণিকর্ণিকা সম্বন্ধে প্রচলিত পৌরাণিক বৃত্তান্ত অনেক। তপশ্চর্যার পর চক্র দিয়ে এক জলাশয় সৃষ্টি করে তাঁর স্বেদাম্বুতে পূর্ণ করেন সেই সায়র। বিষ্ণুনির্মিত এই অপরূপ পুষ্করিণী দেখতে শিব ও পার্বতী সশরীরে সেখানে আগত হন। পার্বতী সেই কুণ্ড দেখে আনন্দে আপ্লুত হয়ে কখন বিস্ময়ে মাথা ঝাঁকান, তখন তাঁর কর্ণকুণ্ডল পড়ে যায় জলের মধ্যে। সেই থেকে উদ্ভব মণিকর্ণিকার।

'কাশীখণ্ড' থেকে জানা যায় যে, কাশীতে জীবের মৃত্যু হলে স্বয়ং বিশ্বনাথ এসে তাকে তারকব্রহ্ম নাম দিয়ে নির্বাণমুক্তি দেন। সেজন্য এ তীর্থের পরিচিতি মণিকর্ণিকা রূপে। এই পীঠস্থানে এসে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এক বিস্ময়কর দর্শন হয়েছিল। সেই ভাবতরঙ্গ সম্পর্কে ঠাকুরের নিজের কথা—'দেখলাম পিঙ্গলবর্ণ জটাধারী দীর্ঘকায় এক শুভ্রকান্তি পুরুষ গম্ভীর পদবিক্ষেপে শ্মশানে প্রত্যেক চিতার পার্শ্বে আগমন করছেন এবং প্রত্যেক দেহীকে সযত্নে উত্তোলন করে তার কর্ণে তারকব্রহ্ম মন্ত্র প্রদান করছেন। সর্বশক্তিময়ী শ্রীশ্রীজগদম্বাও স্বয়ং মহাকালীরূপে জীবের অপর পার্শ্বে সেই চিতার ওপর বসে জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ প্রভৃতি সকলপ্রকার সংস্কার বন্ধন খুলে দিচ্ছেন এবং নির্বাণের দ্বার উন্মুক্ত করে স্বহস্তে তাকে অখণ্ডের ঘরে প্রেরণ করছেন।'

কন্যাকুমারী : ভারতের শেষ প্রান্তভূমি তিনটি সমুদ্রের মিলনস্থলে এক অতুলনীয় সৌন্দর্যের বাহক কন্যাকুমারী। দুর্গতিহরা দুর্গা এখানে কুমারী রূপে আরাধিতা।

বিশ্বজগতের যিনি অধীশ্বরী সাধকের চিন্তা ও চিন্তনে তিনি স্নেহময়ী জননী আবার কখনো কন্যারূপিণী কুমারী। সমুদ্রের তীরে অবস্থিত পরাশক্তির এই নয়নাভিরাম মন্দিরের অধিষ্ঠাতা কুমারিকা দেবীকে নিয়ে কিংবদন্তী বিভিন্ন পুরাণ ও ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। এরকম একটি মজার প্রাচীন কাহিনি : স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালবিজয়ী বাণাসুরের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য আকুলব্যাকুল হয়ে দেবতারা সকলে একত্রিত হয়ে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হলেন। দেবতাদের কাছ থেকে এই বিপত্তির কথা শুনে মধুসূদন তাঁদের পরামর্শ দিলেন পরাশক্তিকে প্রসন্ন করার জন্য এক যজ্ঞ করতে, যাতে অসুর বিনাশ হয়। কারণ বাণাসুর বর পেয়েছিল যে সে অন্য কারোর হাতে নয়, কেবলমাত্র কোনো এক কুমারীর দ্বারাই সে নিধন হতে পারে। ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রের নেতৃত্বে এক বিরাট যজ্ঞ শুরু করলেন। তাতে সকল দেবতার নিজ নিজ তেজোরাশি বেরিয়ে এল সেই যজ্ঞের আহুতির জন্য। ফলে সেই যজ্ঞাগ্নি হতে আবির্ভূতা হলেন দিব্য দীপ্তিমালিনী এক ভুবনমোহিনী বালিকা-কন্যা। এদিকে 'সুচিন্দ্রম্'-এর শঙ্কর সেই জ্যোতির্ময়ী কুমারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করতে চাইলেন। তখন দেবতারা দেখলেন দেবী কুমারীর যদি বিবাহ সম্পন্ন হয় তবে

বাণাসুরকে বিনাশ করার সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ কুমারী ব্যতিরেকে বাণকে কেউই বধ করতে পারবে না। এ কথা উপলব্ধি করে দেবতারা অত্যন্ত সুকৌশলে বিবাহ বানচাল করে দিলেন। তারপর ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই দিব্যাস্ত্রী কুমারী মূর্তির স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন। সংকট মুক্তির ঐকান্তিক প্রার্থনায় পরমপ্রকৃতি দনুজহননী ভদ্রা ভগবতী সুসজ্জিত হয়ে দীর্ঘ ন'দিন যুদ্ধ করে বাণাসুরকে নিহত করলেন। বাণ বধ হল বটে কিন্তু দেবী কুমারী হয়েই থেকে গেলেন।

কন্যাকুমারী মন্দিরে রয়েছেন দেবী কুমারী কন্যা। পূর্ণাকৃতি পদ্মাসনে দণ্ডায়মানা দ্বিভুজা অক্ষয়মালাধারিণী এই মহামাতৃকার মূর্তি অপূর্ব নয়নাভিরাম। মাথায় সোনার মুকুট। দেবীর নাকে হিরের নথের উজ্জ্বল আলোয় গোটা মন্দির বিকীর্ণ। তবে পুরুষদের উন্মুক্ত গায়ে দেবীর দর্শনে মন্দিরে প্রবেশ করার বিধি।

১৮৯২-এর ডিসেম্বর মাস। যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক জীবনে তিন সাগরের মহামিলন ক্ষেত্র কন্যাকুমারীর শেষ শিলাখণ্ডে বসে ডুবে গিয়েছিলেন এক ঐতিহাসিক ধ্যানে। কুমারী জননীর কৃপায় নেমে এলেন তিনি ভারত জীবনে এক যুগস্রষ্টার ভূমিকায়। উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তিনি শিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে যোগদানে।

চামুণ্ডেশ্বরী : মহীশূর শহরের দক্ষিণ-পূর্বে চামুণ্ডী পাহাড়ের শীর্ষে বিরাজ করছেন দেবী চামুণ্ডেশ্বরী। এই পর্বতের উচ্চতা ১০৯৫ মিটার। মহীশূরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চামুণ্ডা মাতা দুর্গাদেবীরই নামান্তর। মহীশূরের রাজবংশের আরাধ্যা এই চিন্ময়ী মহাশক্তি। পুরাকালে এই শহরটি মহিষাসুরের শহর নামে পরিচিত ছিল। দেবী দুর্গা এখানে রণভয়ঙ্করী চামুণ্ডেশ্বরী রূপ ধারণ করে এক প্রলয়ংকর যুদ্ধে সসৈন্যে মহিষাসুরকে বধ করে স্বর্গ ভ্রষ্ট দেবতাগণকে দান করেছিলেন ঐশ্বর্য, বিজয় ও প্রতিষ্ঠা। পাহাড়ের চূড়ায় দর্শনীয় এই মন্দিরের অভ্যন্তরে গর্ভগৃহে বিরাজমানা অষ্টভুজশালিনী, পশুরাজবাহিনী অসুররাজমর্দিনী ভগবতী মহিষাসুরকে বধ করার ভঙ্গিতে দণ্ডায়মানা সুদৃশ্য এক রৌপ্য সিংহাসনে। এই অষ্টভুজা প্রস্তর প্রতিমার পরনে রক্তবস্ত্র, অঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কার। মাথায় তাঁর সোনার মুকুট। দেবীর সুসজ্জিত হাতগুলিতে বিরাজিত নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র। এখানে 'দশেরা' প্রাচীনকাল থেকে চিহ্নিত হয়ে আসছে মহিষাসুরকে নিধন করার দিন হিসাবে। এদিন দেবী চামুণ্ডেশ্বরীকে নিয়ে বর্ণাঢ্য পরিক্রমা দশেরার সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। কাছেই রয়েছে মহাবালেশ্বর নামে শিবের মন্দির। পাহাড়ে উঠবার পথে পাথরে খোদাই করা প্রায় ১৬ ফুট উঁচু একটি বিরাট 'নন্দী'ও রয়েছে। প্রতি বছর বেলুড় মঠের মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দ স্বামী রঙ্গনাথানন্দকে দিয়ে চামুণ্ডা মন্দিরে পুজো পাঠাতেন।

কনকদুর্গা : চেন্নাই রাজ্যের বিজয়ওয়াড়া পবিত্র কৃষ্ণানদীর তীরবর্তী একটি শহর। স্কন্দপুরাণে কৃষ্ণা মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে যে, কৃষ্ণানদীতে স্নান করলে গঙ্গাস্নানের সমধিক পুণ্য হয়। তাই এই নদীর অপর নাম কৃষ্ণগঙ্গা। মহাভারতে এই পুণ্যসলিলার মহিমা বিবৃত। 'সদা নিরাময়াং কৃষ্ণাং মন্দগাং মন্দবাহিনীম্।' কৃষ্ণাঘাটের পাশেই ইন্দ্রকিলা পাহাড়ে কনকদুর্গার মনোরম দর্শনীয় মন্দির। বাসে চেপেও ইন্দ্রকিলা বা অর্জুনকোণ্ডা পর্বতে যাওয়া যায়। মন্দিরের এক কিলোমিটার আগে পড়ে দক্ষিণ ভারতীয় রীতিতে গঠিত গোপুরম। এটি পেরিয়ে মন্দিরে পৌঁছানোর পথে পড়ে অজস্র দোকানপাট। ভেতরে ঢোকার মুখে দেবীর পুজোসামগ্রী ও ফুল-ফলের কেনাবেচা। নানা অলংকারে শোভিত আগাগোড়া সোনার এই দেবীমূর্তি অপূর্ব লাবণ্যময়ী ও প্রসন্নময়ী। চতুর্ভুজা কনকদুর্গা এখানে বরাভয়প্রদা। কথিত আছে এই কনকদুর্গা একটি উপপীঠ। দেবীর লোম এখানে পতিত হয়েছিল। এই মহাদেবী এখানে অর্চিতা চণ্ডনায়িকারূপে। দেবীর ভৈরব হলেন চণ্ডেশ্বর। প্রায় প্রতিদিন গড়ে এখানে পাঁচ সহস্রাধিক নরনারীর সমাগম হয়। প্রতি মঙ্গল ও শনিবারে লোকসমাগম এক অন্যরূপ ধারণ করে। দুর্গাসপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত এখানে মহাসমারোহের সঙ্গে দুর্গাপুজোর পর্ব সুসম্পন্ন হয়। অমিত প্রভাবতী সুদর্শনা কনকদুর্গার এই শারদোৎসবে শহরবাসীর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও ভক্তি আজও সমভাবে অটুট। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হাজার হাজার গৃহদুর্গা ডালি হাতে মাতৃমন্দিরে জড়ো হন অর্ঘ্য দেওয়ার জন্য। নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের শব্দে ও বংশীর ধ্বনিতে এই পীঠভূমি নবরাত্রের দিনগুলিতে হয় মুখরিত। জনশ্রুতি যে, দেবী কনকদুর্গার নাসিকার নথ কৃষ্ণানদীর জল যেদিন স্পর্শ করবে ঠিক তখনই শুরু হবে প্রলয়ের দুর্বিপাক।

নন্দাদেবী : মধ্য হিমালয়ের পাদদেশে কুমায়ুন জেলার প্রধান শহর আলমোড়ায় দুর্গের মধ্যে যে সুদৃশ্য মন্দির বিদ্যমান তা নন্দাদেবীর মন্দির হিসেবে প্রসিদ্ধ। পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা এই প্রাচীন অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আদ্যাশক্তি মহামায়া দুর্গারূপে বরণ করে নিয়েছেন অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে।

দুর্গতিহারিণী দুর্গাদেবীর একটি নাম নন্দা। মার্কেণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীর 'মূর্তি রহস্যে'র মধ্যে এই নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই নন্দানন্দিনী নন্দাদেবীই 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'তে নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা রূপে বিঘোষিত হয়েছেন।

আলমোড়ায় নন্দাদেবীর যে বিগ্রহ বর্তমানে সেটির অবস্থান অন্যত্র। সাড়ে তিনশো বছর আগে স্থানীয় রাজারা এই নয়নাভিরাম দেবীমূর্তি তাঁদের দুর্গের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠা করে যথোচিত নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও ভক্তির সঙ্গে সেবা-পূজা করতে থাকেন। এই চতুর্ভুজা মহাদেবী অতি উজ্জ্বল, সুবর্ণ, কান্তিযুক্তা, হোমালঙ্কার ভূষিতা এবং মনোহর বস্ত্রে মঞ্জিমায় তিনি সুশোভিতা। কৃষ্ণ অনুজা এই নন্দদুহিতার চার হাতে পদ্ম, অঙ্কুশ, পাশ, শঙ্খরাজিত। উল্লেখ্য শ্রীমদ্ভাগবতে যে যোগমায়া নন্দাদেবীর বিবরণ আমরা পেয়ে থাকি, তিনি অষ্টভুজশালিনী এবং অষ্টপ্রহরণধারিণী।

সেনাবাহিনীর কড়াকড়ির জন্য স্থানীয় লোকদের দুর্গের মধ্যে গিয়ে নন্দাদেবীর দর্শন ও তাঁর পুজো-আচারে বিস্তর অসুবিধায় পড়তে হত। এদিকে ইংরেজদের রাজত্ব শুরু হওয়ার পর মন্দিরের সমস্ত সম্পত্তি দখল হয়ে গিয়ে দুর্গে সাধারণ লোকের যাতায়াত নিষিদ্ধ হওয়ায় কালক্রমে এই জাগ্রতা দেবীর আরাধনাও বন্ধ হয়ে যায়। কিছুদিন পরে ওইসব পার্বত্য অঞ্চলে ভারপ্রাপ্ত হয়ে এলেন ডেপুটি কমিশনার জি. ডব্লিউ ট্রেল সাহেব। বিধর্মী হয়েও তিনি আলমোড়ায় কেন্দ্রস্থলে সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করে নন্দাদেবীকে সেই দুর্গ থেকে এনে তাঁকে মহাধূমধামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেন। সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধার করে উপযুক্তভাবে সেবা-পূজারও ব্যবস্থা করে দিলেন উদার প্রকৃতির এই সাহেব। এরপর থেকে নন্দাদেবীর মাহাত্ম্য জনমানসে আরও গভীরভাবে প্রসারিত হয়। আলমোড়ায় তিনটি বড় পর্বত আছে, তার মধ্যে একটি নন্দাদেবীর নামে উৎসর্গীকৃত।

পর্বতারোহীরা এখনও যাঁরা যান, তাঁরা নন্দাদেবীর অর্চনা করে তাঁর অনুমতি নিয়ে অভিযান শুরু করেন। সারা বছর জুড়ে স্থানীয় পুজোপার্বণ এবং আচার-অনুষ্ঠানের জাঁকজমকের কোনো ত্রুটি নেই দেবীমন্দিরে। আবার নবরাত্র ও শারদীয়া দুর্গোৎসব এলে এই দেবীতীর্থ আরও বেশি করে জেগে ওঠে।

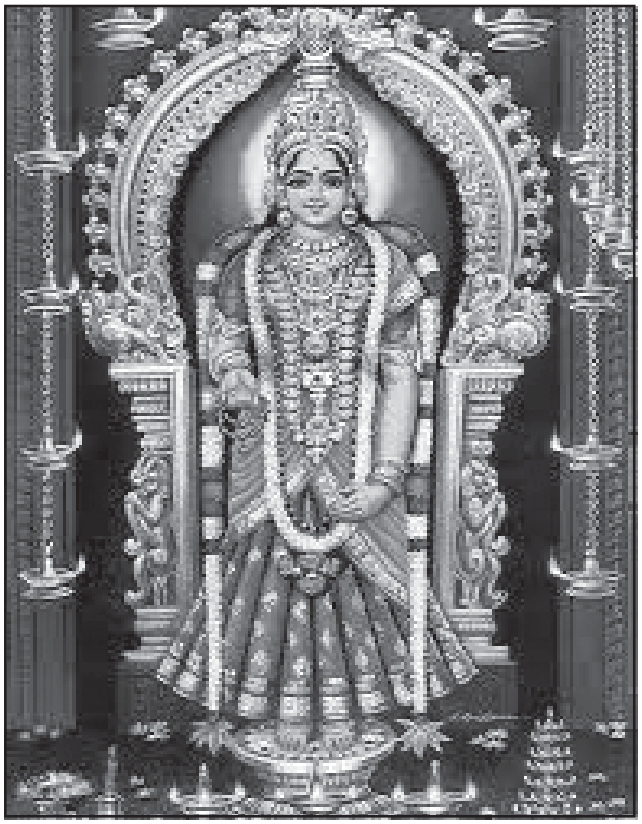

● দেবী কন্যাকুমারী।

শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে দুর্গাসংগীত

ড. সন্দীপকুমার দাঁ

শ্রীরামকৃষ্ণের সংগীতপ্রিয়তার কথা সর্বজনবিদিত। শ্রীশ্রীমা বলতেন, "আহা, গান গাইতেন তিনি (ঠাকুর), যেন মধুভরা, গানের উপর যেন ভাসতেন! সে গানে কান ভরে আছে। এখন যে গান শুনি, সে শুনতে হয় তাই শুনি।'

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন গান গাইতেন, তখন গানের অন্তর্নিহিত ভাবগুলি সজীব হয়ে উঠত, যেন এক শক্তির জাগরণ হত। যাঁরাই তাঁর কণ্ঠে গান শুনেছেন, তাঁরাই উপলব্ধি করেছেন। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ লিখেছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের গানের মাধুর্যভাবে। তিনি এমন আবেগ দিয়ে গান গাইতেন যে শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত। তাঁর ভাবে সবাই অনুপ্রাণিত হত। তিনি কাঁদলে সবার চোখে জল। বলাবাহুল্য শ্রীরামকৃষ্ণের গানে যেন তাঁর অন্তর্জীবনের দরজা-জানালা খুলে যেত, তার ভেতর দিয়ে হঠাৎ শীতল বাতাস এসে শ্রোতাদের 'তপ্তজীবন'কে আনন্দ ও তৃপ্তি দিয়ে জুড়িয়ে দিয়ে যেত। এ এক আধ্যাত্মিক অনুভূতি। ... তিনি গান গাইতেন লোকশিক্ষার জন্যে! সকলের মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাব জাগানোর জন্যে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় ছিল আগমনী গান এবং দেবী দুর্গার বন্দনা গান। শ্রীম বলেছেন, "ঠাকুর দেবীপক্ষ পড়তেই সকালবেলা দু'হাত তুলে 'দুর্গে দুর্গে' বলে নৃত্য করতেন। প্রতিপদ থেকে কোজাগরী পূর্ণিমা পর্যন্ত নিত্য।" এই সূত্রে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দেখার পর ঠাকুর গিরিশবাবুকে বলেছিলেন, "বেশ লিখেছেন, আমাদের কত আনন্দ দিলেন।" গিরিশবাবু উত্তরে বললেন, "মশায় আমার কথা আর বলবেন না। আমি যেখানে বসি সেখানকার সাত হাত মাটি অশুদ্ধ অপবিত্র হয়ে যায়।" ঠাকুর অমনি ভাবোন্মত্ত হয়ে গান গাইতে লাগলেন—

"আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী।
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি।।"

এ গানটি শুনে গিরিশবাবু ভরসা পেলেন এই ভেবে যে, ঠাকুরের কৃপা হয়েছে।

প্রসঙ্গত বলি, ঠাকুর বহুবার এ গানটি গেয়েছেন, কখনো কখনো নৃত্য করতে করতে এই গানটি গাইতেন। প্রারব্ধ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মাস্টারমশায় একদিন বলেছিলেন, "এই প্রারব্ধও বদলে যায় ঈশ্বরের কৃপা হলে—ঠাকুর বলতেন, এই গানটি গাইতেন—

'কপালে লিখেছে বিধি, তাই বলবান যদি,
তবে ও মা তোর দুর্গা নাম কে নেবে?'

(প্রকৃত গানটি হল—কপালে যা আছে, কালী তাই যদি হবে/শ্রীদুর্গা জয়দুর্গা বলে কেন ডাকা তবে)

কোনো এক সময় দুর্গাপ্রতিমা দর্শন করে আহ্লাদে নাচতে নাচতে শ্রীরামকৃষ্ণ এই ঝুমুর গানটি গেয়েছিলেন—

'কে মা এলি গো গিরে দাদার বেটি
দোনো ছোকরা বি সাৎ দোনো ছুকরি বি সাৎ,
আর এক বেটা জুলপি কাটা, বাঘটা কামড়ে নেচে টুটি।।'

দুর্গার গান গাইতে গাইতে বা শুনতে শুনতে, দুর্গানাম করতে করতে ঠাকুর প্রায়ই ভাবাবিষ্ট হয়ে যেতেন, কখনও-বা হয়ে যেতেন সমাধিস্থ।

লেখক—প্রাক্তন কলেজ অধ্যক্ষ, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গ্রন্থকার।

● দুর্গতিনাশিনী দুর্গা।

একবার সংসারী বদ্ধজীবের অবস্থা বর্ণনা করে ঠাকুর বলেছিলেন, "জীব যেন ডাল, জাঁতার ভিতর পড়েছে; পিষে যাবে। তবে যে কটি ডাল খুঁটি ধরে থাকে, তারা পিষে যায় না। তাই খুঁটি অর্থাৎ ঈশ্বরের শরণাগত হতে হয়। তাঁকে ডাকো, তাঁর নাম করো তবে মুক্তি। তা না হলে কালরূপ জাঁতায় পিষে যাবে।' —এই কথাগুলি বলে এই প্রসঙ্গে এই গানটি ঠাকুর গেয়েছিলেন।

"পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী।
মায়া-ঝড় মোহ তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী।।
একে মনমাঝি আনাড়ি, তাতে ছ'জন গোঁয়ার দাঁড়ি।
কু-বাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি।।
ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল,
ছিঁড়ে গেছে শ্রদ্ধার পাল,
তরী হল বানচাল, বলো কি করি।
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার,
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার, দুর্গা নামের ভেলা ধরি।।"

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত'র লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল উল্লেখ করেছেন একটি দেবী দুর্গার গানের যেটি শ্রীরামকৃষ্ণ গাইতেন :

"দুর্গে এবার কর মা এ দীনের উপায়।
যেন পায়ে স্থান পাই।।
আমার এ দেহ পঞ্চত্বকালে তব প্রিয় পঞ্চস্থলে,
মম পঞ্চ ভূতাত্মা যেন মিশায়।।
আমার এ মৃত্তিকা যায় যেন ত্বৎ প্রতিমায়
মা মোর পবন যেন চামর ব্যজনে যায়,
হোমাগ্নিতে মমাগ্নি যেন মিশায়।
শ্রীমন্দিরের অন্তরে আকাশ রয়।।
আমার যায় যেন জল অর্থজলে,
ভবে জন্ম যায় বিফলে,
দাশরথি জীবনে মরণ দায়।।"

সাধক রামপ্রসাদ রচিত একটি বিখ্যাত দুর্গাসংগীতও ঠাকুরকে গাইতে শোনা যেত—

"কাজ কি মা! সামান্য ধনে।
ও কে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে।।
সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দেও মা অভয় চরণ, রাখি হৃদি-পদ্মাসনে।।
গুরু আমায় কৃপা করে মা, যে ধন দিলে কানে কানে।
এমন গুরু আরাধিত মন্ত্র, তাও হারালেম সাধন বিনে।।
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা হবে তোমার নিজ গুণে।
আমি অন্তিম কালে জয়দুর্গা বলে স্থান পাই যেন ঐ চরণে।।"

দক্ষিণেশ্বরের বাচস্পতি পাড়া নিবাসী নবকুমার চাটুজ্জে ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তিনি প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে তাঁর পবিত্র সঙ্গলাভ করে আনন্দ পেতেন। মাঝে মাঝে তিনি নিজের বাড়িতে ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করে আনতেন এবং পরম ভক্তিভরে ঠাকুরকে আহার করাতেন। নবকুমারের বাড়িতে দুর্গোৎসব হত এবং সেই উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন হত। ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ঘটনা। ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে ভাবগম্ভীর পরিবেশে মা দুর্গার আরাধনা হচ্ছে। মহাষ্টমীর দিন সন্ধিপুজোর কিছু আগে ভাবে মাতালের মতো হয়ে হৃদয়ের কাঁধ ধরে ঠাকুর পুজোমণ্ডপে উপস্থিত হলেন। পুজোমণ্ডপে দুর্গাপ্রতিমার সামনে বসে ঠাকুর মায়ের পাদপদ্ম থেকে শ্রীমুখ অবধি লক্ষ করতে লাগলেন। যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন সবাই উপলব্ধি করলেন আনন্দের মধ্যে গাম্ভীর্যতা, অনুভব করলেন সাধারণ ঢাক-ঢোল-কাঁসরের শব্দের মধ্যেও প্রাণের স্পন্দন। ভাবে বিভোর অবস্থায় ঠাকুর রামপ্রসাদী গান ধরলেন—

"শ্রীদুর্গার নাম ভুলো না।
ভুলো না, ভুলো না, ভুলো না।
শ্রীদুর্গা স্মরণে সমুদ্র মন্থনে
বিষ পানে বিশ্বনাথ ম'ল না।
যদ্যপি যখন বিপদ ঘটে,
শ্রীদুর্গা স্মরণ করগো সঙ্কটে
তারায় দিয়ে ভার সুরথ রাজার
লক্ষ অসি ঘাতে প্রাণ গেল না।
বিভু নামে এক রাজার ছেলে
যাত্রা করেছিল শ্রীদুর্গা বলে
আসিবার কালে সমুদ্রের জলে
ডুবেছিল তাতে(তার) মরণ হল না।"

মিষ্ট গলায় ঠাকুরের গাওয়া সেই গানের ভাবের গভীরতায় সকলে সম্মোহিত। ভাবে বিভোর অবস্থায় ঠাকুর মাঝে মাঝে চমকে উঠতে লাগলেন। ঠাকুরের গান শেষ হলে সকলে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। নবকুমার মায়ের প্রসাদ দিয়ে পরম ভক্তিভরে ঠাকুরকে আপ্যায়ন করলেন। ঠাকুর মাঝে মাঝে মায়ের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চাইছেন আর 'মা' 'মা' বলে ডেকে উঠছেন। তাঁর সেই 'মা' 'মা' ডাকে মহামায়া সজীব হয়ে উঠছেন।

উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছেন। মাকে সন্তানের এই দরদি আহ্বান দুর্গাদালানে উপস্থিত সকলের হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করে। কিছুক্ষণ পরে হৃদয়ের কাঁধ ধরে ঠাকুর ধীরে ধীরে দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে ফিরে যান।

রামলালদাদা তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, "একদিন সকালে দুর্গাপুজোর চার-পাঁচ দিন আগে আমি ঠাকুরকে নিয়ে শৌচে গেছি। আমি দাঁড়িয়ে আছি, ভূষণ মালাকার (জেলে) গঙ্গায় ইলিশ মাছ ধরছে আর—"কহে শিখরী জামাই নাই ভিকারী"—ঐ গান গাচ্ছে, ঠাকুর শুনে সমাধিস্থ। তারপর ঠাকুর আমায় বললেন, "ওরে রামলাল, দেখ কি সুন্দর গান হচ্ছিল রে, তুই শুনেছিস?" ... ঠাকুর বললেন, "ওকে একবার ডাক না। আমি ভূষণকে ঠাকুরের ঘরে ডেকে আনলুম, সে ঠাকুরকে দুখানা গান শোনালে। তিনি শুনে চক্ষের জলে ভেসে গেলেন ও সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর ঠাকুর বললেন, "ওরে ভূষণকে কিছু খাবার দে।" আমি লুচি সন্দেশ প্রচুর পরিমাণে দিলুম। ঠাকুর তাকে বললেন, "তুমি রবিবারে এসে গান শুনিও আর এখানে প্রসাদ পেও। তোমায় কিছু পাইয়ে দেবো। এখানে অনেক ধনী ভক্তেরা আসে।"

বলরাম, সুরেশবাবু ও অন্যান্য ভক্তদের কাছে টাকাপয়সা তুলে ভূষণকে প্রায় আট-দশ টাকা দেওয়া হল। ঠাকুর আমায় বললেন, "ওরে রামলাল, ভূষণের কাছ থেকে গানগুলো লিখে নে।" আমি লিখে নিলুম ও ঠাকুরকে মধ্যে মধ্যে শোনাতুম। আর তিনিও গাইতেন।

যে আগমনী গান দুটি ভূষণের গলায় শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ চোখের জলে ভেসেছিলেন এবং সমাধিস্থ হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে রামলাল দাদার গলায় শুনতেন ও নিজেও গাইতেন, সেই গান দুটি হল—

১। ওহে শিখরী জামাই নাই ভিখারী
এখন শিবের স্বর্ণপুরী
সে যে রত্নময়ী কাশী (দেখে এলাম) তাতে উমাশশী
অন্নপূর্ণা নাম রাজরাজেশ্বরী।।
শিবের সাধের কাশীধাম, কেবল মোক্ষধাম
পূর্বদিকে গঙ্গা সুরেশ্বরী।।
কিবা রত্নকাশী, কাশীর উপমা নাই তার ত্রিজগতে
কিবা শিবে রত্নকাশী,
সোনার কাশী তেজ্য করে আসবেন শঙ্করী।।

২। শিবের তুল্য জামাই আছে কার।
তুমি জানো না শিখরী কত পুণ্য করি
শিবকে দান করেছি প্রাণের কুমারী,
এখন আমার গৌরী রাজ-রাজেশ্বরী
কাশীধামে চমৎকার।।
আর কি জামাই আমার আছেন শ্মশানবাসী,
দেখবে চলো রানী শিবের স্বর্ণকাশী।
কাশীর কথা কি আর এক মুখে প্রকাশি,
শত মুখে কওয়া ভার।।

রামলাল দাদার স্মৃতিকথায় আরো একটি আগমনী গান এবং একটি দেবী দুর্গার গানের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে যেগুলি ঠাকুর গাইতেন, গানগুলি এখানে উদ্ধৃত করছি—

১। পা তোল, পা তোল উমা, রজনী প্রভাত হলো
মঙ্গল আরতি হবে, উমা সর্বমঙ্গলে।।
যামিনী হইল গত, উদয় মা দিননাথ,
অলসে ঘুমারে কত, চাঁদবদনে মা মা বলো।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ করিতেছেন আগমন,
পূজিতে ও শ্রীচরণ করে জবা বিল্বদল।
তিন দিন রাখিয়ে বুকে, করি মা জনম সফল।
তুমি মা যাবে কৈলাসে, কি উপায় এ-দাসের দাসে,
নীলকণ্ঠের বারো মাসে বারো রিপু প্রবল হলো।।

২। আমি আছি মা তারিণী, ঋণী তব পায়।
মা! আমার অনুপায়।।
ভজন পূজন দিয়ে বিসর্জন, দিয়ে জননী গো।
বিষয় বিষ-ভোজনে প্রাণ যায়।।
জঠরে যাতনা পেয়ে বলিলাম,
এবার ভজিতে তোমায় ভবে চলিলাম,
সুপুত্র হব রব স্বপনে, ত্রিপত্র দিব তব শ্রীপদে,—
ধরায় পতিত হয়ে রয়েছি পতিত হয়ে,
পতিতপাবনী। ভুলে মা তোমায়।।
হলো না সাধনা আর হয় না।
হে দুর্গে! আমার মন দুঃখ আর সয় না,
অপার দাশরথি, শঙ্করী!—
হয় না মানস বশ কি করি;—
মা! যদি মোর মনে করি, স্বগুণে বন্ধন করি,
কর মুক্ত, মুক্তকেশী। এ ভববন্ধন-দায়।।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুন। দক্ষিণেশ্বরে, কাত্যায়নী পূজার রাত। শ্রীরামকৃষ্ণ নাটমন্দিরে মা-র সামনে দাঁড়িয়ে প্রেমাবিষ্ট হয়ে মা-র সঙ্গে কথা বলছেন, "মা তুমিই ব্রজের কাত্যায়নী।" এরপর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে কীর্তন ধরলেন—

"তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্য মা, তুমি সে পাতাল ..."

পুরো গানটি হল—

শ্রীদুর্গা জপ সদা রসনা আমার!
দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে নিস্তার।।
দুর্গানাম তরী ভবার্ণব তরিবারে,
ভাসিতেছে সেই তরী, শ্রদ্ধাসরোবরে।
শ্রীগুরু করুণা করি যেই ধন দিলে,
সাধনা করহ তরী মিলিবে গো কূলে।।
যদি বল ছয় রিপু হইয়ে পবন,
ধরিতে না দিবে তরী করিবে তুফান।
তুফানেতে কি করিবে শ্রীদুর্গা নাম যার তরী,
অবশ্য পাইবে কূল মৃত্যুঞ্জয় যার কাণ্ডারী।।
তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্য মা, তুমি সে পাতাল;
তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল।
দশ মহাবিদ্যা মাতা দশ অবতার,
এবার কোন রূপে আমায় করিতে হবে পার।।
চল অচল তুমি মা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল,
সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় তুমি মা তুমি বিশ্বমূল,
ত্রিলোকজননী তুমি, ত্রিলোক তারিণী;
সকলের শক্তি তুমি মা তোমার শক্তি তুমি।।
বায়ু অন্ধকার আদি শূন্য আর আকাশ,
রূপ দিক দিগন্তর তোমা হতে প্রকাশ।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি করি যতেক অমরে,
তব শক্তি প্রকাশিছে সকল শরীরে।।
ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না বজ্রা চিত্রানীতে,
ক্রমযোগে আছে জেগে সহস্রা হইতে।
চিত্রানীর মধ্যে ঊর্ধ্বে আছে পদ্ম সারি সারি,
শুক্লবর্ণ সুবর্ণবর্ণ বিদ্যুতাদি করি।।
দুই পদ্ম প্রস্ফুটিত এক পদ্ম কোঢ়া,
অধোমুখে ঊর্ধ্বমুখে আছে দুই পদ্ম জোড়া।
হংসরূপে বিহার তথায় কর গো আপনি,
আবার কমলে হও মা কুলকুণ্ডলিনী।।
তদূর্ধ্বে মণিপুর নাম নাভিস্থল,
রক্তবর্ণ পদ্ম তাহে আছে দশদল।
সেই পদ্মে তব শক্তি অনল আছয়,
সে অনল নিবৃত্তি হলে সকলই নিভায়।।
হৃদিপদ্মে আকাশ মানস সরোবর,
অনাহত পদ্ম ভাসে তাহার উপর।।
সুবর্ণবর্ণ দ্বাদশদল তথায় শিব বান,
সেই পদ্মে তব শক্তি জীব আর প্রাণ।।
তদূর্ধ্বে কণ্ঠদেশ ধূম্রবর্ণ পদ্ম,
ষোড়শদল নাম তাঁর পদ্ম বিশুদ্ধাখ্য।
সেই পদ্মে তব শক্তি আছয়ে আকাশ,
সে আকাশ রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ।।
তদূর্ধ্বে শিরসি মধ্যে পদ্ম সহস্রদল,
গুরুদেবের স্থান সেই অতি গুহ্যস্থল।
সেই পদ্মে বিশ্বরূপে পরমশিব বিরাজে,
একা আছেন শুক্লবর্ণ সহস্রদল পঙ্কজে।।
ব্রহ্মরন্ধ্র আছে যথা শিব বিম্বরূপ,
তুমি তথা গেলে শিব হন স্বীয়রূপ।
তথা শিবসঙ্গে রঙ্গে কর গো বিহার,
বিহার সমাপনে শিব হন বিম্বাকার।।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল ছিল চৈত্র শুক্লাষ্টমী, বাসন্তী পূজার অষ্টমী এবং অন্নপূর্ণা পূজা। কথামৃতকার লিখেছেন—

"আজ শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা। ... সুরেন্দ্র মায়ের পূজা আনিয়াছেন। তাই ঠাকুরের নিমন্ত্রণ। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসিয়াছেন, আসিয়া ঠাকুরদালানে উঠিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিমা দর্শন করিলেন, প্রণাম ও দর্শনান্তর দাঁড়াইয়া মার দিকে তাকাইয়া শ্রীকরে মূল মন্ত্র জপ করিতেছেন, ভক্তেরা ঠাকুর-প্রতিমা দর্শন ও প্রণামান্তর প্রভুর কাছে দাঁড়াইয়া আছেন।" ...

"রাত্রি প্রায় সাড়ে নটা। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ঠাকুরদালান আলো করিয়া আছেন সম্মুখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে দাঁড়াইয়া। ... তাঁহারা (ভক্তেরা) সকলে ঠাকুরের সঙ্গে প্রসাদ পাইয়াছেন। সুরেন্দ্র সকলকে পরিতোষ সহকারে খাওয়াইয়াছেন। ... সকলেই ঠাকুরদালানে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন।

সুরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — আজ কিন্তু মায়ের নাম একটিও হল না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঠাকুরের প্রতিমা দেখাইয়া) — আহা, কেমন দালানের শোভা হয়েছে। মা যেন আলো করে বসে আছেন। এরূপ দর্শন কল্লে কত আনন্দ হয়। ভোগের ইচ্ছা, শোক—এসব পালিয়ে যায়। ...

ঠাকুর মা'র নাম করিয়া গান গাহিতেছেন :

"মাগো আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ করো না।
ও দুটি চরণ বিনা আমার মন, অন্য কিছু আর জানে না।।
তপন-তনয়, আমায় মন্দ কয়, কি দোষে তাতো জানি না।
ভবানী বলিয়ে, ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা,
অকূল পাথারে ডুবাবে আমারে, স্বপনেও তা জানি না।

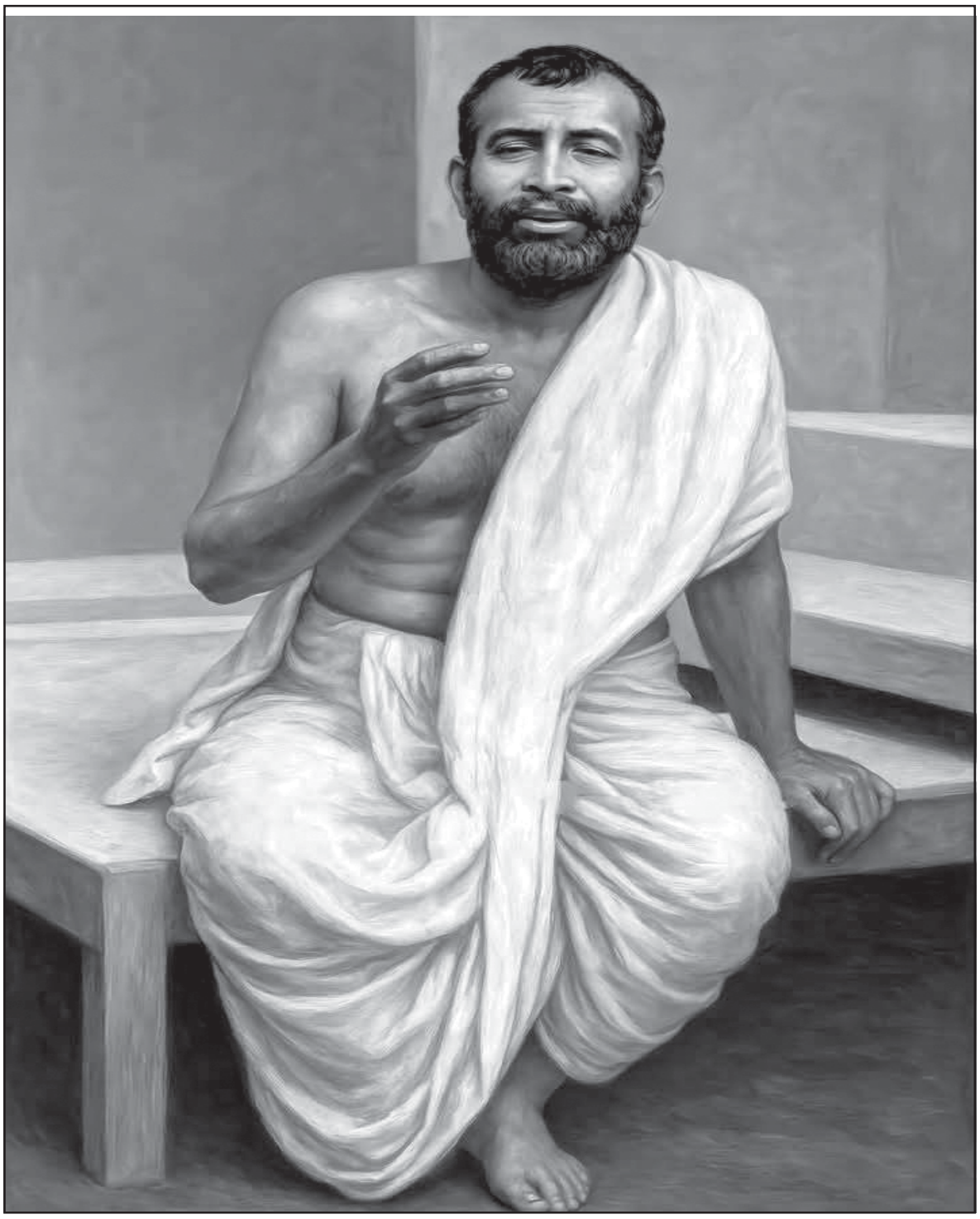

● মাতৃভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ।

এবার যদি মরি, ও হরসুন্দরী (তোর)
দুর্গানাম কেউ আর লবে না।।"

আবার গাহিতেছেন :

বল রে বল শ্রীদুর্গানাম। (ওরে আমার আমার মন রে)।।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে পথে চলে যায়।
শূল হস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায়।।
তুমি দিবা, তুমি সন্ধ্যা, তুমি সে যামিনী।
কখন পুরুষ হও মা, কখন কামিনী।।
তুমি বল ছাড় ছাড় আমি না ছাড়িব।
বাজন নূপুর হয়ে মা চরণে বাজিব।।
(জয় দুর্গা শ্রীদুর্গা বলে)।
শঙ্করী হইয়ে মাগো গগনে উড়িবে।
মীন হয়ে রব জলে নখে তুলে লবে।।
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যখন যাবে মোর পরানী,
কৃপা করে দিও রাঙাচরণ দুখানি।"

গান শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার প্রতিমার সম্মুখে প্রণাম করলেন। অতঃপর গাড়িতে উঠে পুনরায় ভক্তদের প্রণাম গ্রহণ করে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করলেন।

ঠাকুরের অন্যতম প্রিয় গৃহীভক্ত অধরলাল সেনের ৯৭, বেনিয়াটোলা স্ট্রিটের বাড়ির দুর্গোৎসবে পূজাদর্শনে ঠাকুর যেতেন এবং প্রতিমার সামনে ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন। সমাধিভঙ্গে ঠাকুর বলতেন, "এমন হাস্যময়ী প্রতিমা আর দেখা যায় না।" ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের দুর্গোৎসবে মহানবমীর দিন ঠাকুর অধরবাবুর বাড়িতে সন্ধ্যারতি দেখতে এসেছিলেন। সন্ধ্যারতি দর্শন করে ভাবাবিষ্ট হয়ে ঠাকুর মাকে গান শোনান। অধরবাবুর বাড়িতে সেদিন অধরবাবু ছাড়াও আরো অনেক গৃহীভক্ত উপস্থিত ছিলেন। সকলেই ত্রিতাপে তাপিত, তাই সকলের মঙ্গলের জন্য ঠাকুর জগন্মাতার স্তব করেন—

"তার তারিণী। এবার তারো ত্বরিত করিয়ে,
তপন-তনয়-ত্রাসে ত্রাসিত, যায় মা প্রাণী।।
জগত অম্বে জন-পালিনী, জন-মোহিনী জগত-জননী।
যশোদা জঠরে জনম লইয়ে সহায় হরিলীলায়।।
বৃন্দাবনে রাধাবিনোদিনী ব্রজবল্লভ বিহারকারিনী।
রাসরঙ্গিনী রসময়ী হয়ে রাস করিলে লীলাপ্রকাশ।।
গিরিজা গোপজা গোবিন্দ মোহিনী তুমি মা গঙ্গে গতিদায়িনী;
গান্ধার্বিকে গৌরবরণী গাওয়ে গোলোকে গুণ তোমার।
শিবে সনাতনী সর্বাণী ঈশানী সদানন্দময়ী সর্বস্বরূপিণী,
সগুণা নির্গুণা সদাশিবপ্রিয়ে কে জানে মহিমা তোমার।"

গান শেষে ঠাকুর অধরবাবুর দোতলার বৈঠকখানায় গিয়ে বসলেন। কিছু পরে ভাবাবেগে ঠাকুর দেহের মধ্যে ষট্‌চক্র, তার মধ্যে মাকে দেখছেন। তাই আবার ভাবে বিভোর হয়ে গান গাইছেন—

"ভুবন ভুলাইলি মা, হরমোহিনী,
মূলাধারে মহোৎপলে, বীণাবাদ্য-বিনোদিনী।
শরীর শারীর যন্ত্রে সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে,
গুণভেদে মহামন্ত্রে তিন গ্রাম-সঞ্চারিনী।।
আবার ভৈরবাকার ষড়দলে শ্রীরাগ আর,
মণিপুরেতে মল্লার, বসন্তে হৃদপ্রকাশিনী।
বিশুদ্ধ হিন্দোল সুরে, কর্নাটক আজ্ঞাপুরে,
তান-মান-লয়-সুরে, ত্রিসপ্ত-সুরভেদিনী।
মহামায়া মোহপাশে বদ্ধ কর অনায়াসে,
তত্ত্ব লয়ে তত্ত্বাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী।
শ্রীনন্দকুমারে কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়,
তব তত্ত্ব গুণত্রয়, কাকীমুখ আহ্লাদিনী।"

অভয়ার শরণাগত হলে সকল ভয় যায়, তাই বুঝি ভক্তদের অভয় দিতেছেন ও গান গাহিতেছেন :

"অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি।
কালী নাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি।
এ ভক্তি দিয়ে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি।।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।।
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন, শান্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি ক'রে কুড়ায়ে পাবে, শিবযুক্তি মত চাইলে।।
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার-লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হলদি গায় মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।।
রতন মাণিক্য কত পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে, ঝম্প দিলে মিলবে রতন ফলে ফলে।।

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাপূজার দুদিন পড়েছিল। রবিবার ২৮ সেপ্টেম্বর ছিল মহাষ্টমী। সে দিনের বর্ণনাও কথামৃতে পাওয়া যাচ্ছে—"আজ রবিবার মহাষ্টমী, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় প্রতিমা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। অধরের বাড়ি শারদীয়ার দুর্গোৎসব হইতেছে। ঠাকুরের তিন দিন নিমন্ত্রণ। অধরের বাড়ির প্রতিমা দর্শন করিবার পূর্বে রামের বাড়ি হইয়া যাইতেছেন।"

পরম ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে ঠাকুর যখন উপস্থিত হলেন, তখন সেখানে অন্যান্য ভক্তও হাজির হয়েছেন। রামচন্দ্র ছাড়াও সেদিন যেসব ভক্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন—চুনিলাল বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নরেন্দ্রনাথ, বাবুরাম, মাস্টারমশায়, নিরঞ্জন, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ। রামচন্দ্রের বাড়িতে অবশ্য দুর্গাপূজা হত না। ঠাকুর সেখানে ভক্তসঙ্গে ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা করলেন, নরেন্দ্রনাথ গান গাইলেন। নরেন্দ্রনাথের গান শুনতে শুনতে ঠাকুর সমাধিস্থ। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর গিরিরানি ভাব আরোপ করে আগমনী গান শোনালেন তাঁর অমৃতমধুর কণ্ঠে—"গিরিরানী বলছেন, পুরবাসীরে! আমার কি উমা এসেছে?" ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হয়ে গান গাইছিলেন, গান শেষ হলে ভক্তদের বললেন, "আজ মহাষ্টমী কিনা; মা এসেছেন। তাই এতো উদ্দীপন হচ্ছে।" সেখানে উপস্থিত ভক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বললেন, "প্রভু! আপনিই এসেছেন। মা কি আপনি ছাড়া?"

পরদিন মহানবমী। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর খুব ভোরে উঠে পড়লেন। আগের দিন রাত্রে বাবুরাম, নিরঞ্জন, মাস্টারমশায়, ভবনাথ প্রমুখ ভক্ত দক্ষিণেশ্বরেই ছিলেন। তাঁরা চোখ মেলে দেখেন, ঠাকুর মাতোয়ারা হয়ে নৃত্য করছেন আর বলছেন, "জয় জয় দুর্গে! জয় জয় দুর্গে!" মায়ের নাম করতে করতে একটি বালকের মতো ঘরময় নেচে বেড়াতে লাগলেন। এক সময় ঘর থেকে ঠাকুর উত্তরের বারান্দায় এসে বসলেন; সকলের সঙ্গে শুরু করলেন ভগবৎপ্রসঙ্গ।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর ঘরে ফিরে এসে বসলেন, ভক্তদের সঙ্গে বাক্যালাপ চলতে লাগল। এমন সময় নরেন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত। তাঁকে দেখতে দেখতে ঠাকুর সমাধিমগ্ন হলেন। সমাধি ভঙ্গ হলে ঠাকুর সকলকে শোনালেন দুর্গানাম—

"বলরে শ্রীদুর্গা নাম;
(ওরে আমার আমার আমার মন রে)।
নমো নমো নমো গৌরী, নমো নারায়ণী।
দুঃখী দাসে কর দয়া তবে গুণ জানি।।
তুমি সন্ধ্যা, তুমি দিবা তুমি গো যামিনী।
কখন পুরুষ হও মা, কখন কামিনী।।
রামরূপে ধর ধনু মা, কৃষ্ণরূপে বাঁশি।
ভুলালি শিবের মন মা হয়ে এলোকেশী।।
দশমহাবিদ্যা তুমি মা, দশ অবতার।
কোনরূপে এইবার আমারে কর মা পার।।
যশোদা পূজিয়েছিল মা জবা বিল্বদলে।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কৈলি কৃষ্ণ দিয়ে কোলে।।
যেখানে সেখানে থাকি মা, থাকি গো কাননে।
নিশিদিন মন থাকে যেন ও রাঙ্গাচরণে।।
যেখানে সেখানে মরি মা, মরি গো বিপাকে।
অন্তকালে জিহ্বা যেন মা, শ্রীদুর্গা বলে ডাকে।।
যদি বলো যাও যাও মা, যাবো কার কাছে।
সুধামাখা তার নাম, মা আর কার আছে।।
যদি বলো ছাড়া ছাড়া মা আমি না ছাড়িব।
বাজন নূপুর হয়ে মা তোর চরণে বাজিব।।
যখন বসিবে মাগো শিব সন্নিধানে।—
জয় শিব জয় শিব বলে বাজিব চরণে।।
চরণে লিখিত নাম আঁচড় যদি যায়।
ভূমিতে লিখিয়ে থুই নাম, পদ দে গো তায়।।
শঙ্করী হইয়ে মাগো গগনে উড়িবে।
মীন হয়ে রব জলে মা, নখে তুলে লবে।।
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যখন যাবে গো পরানি।
কৃপা করে দিও মা গো রাঙ্গা চরণ দুখানি।।
পার কর মা কালী, কালের কামিনী।
তরাবারে দুটি পদ করেছ তরণী।।
তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্য, তুমি গো পাতাল।
তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল।।
গোলোকে সর্বমঙ্গলা, ব্রজে কাত্যায়নী।
কাশীতে মা অন্নপূর্ণা অনন্তরূপিণী।।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে যেবা পথে চলে যায়।
শূলহস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায়।।"

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা। ঠাকুর তাঁর গান শুনতে খুব ভালোবাসতেন। নীলকণ্ঠ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শুনিয়ে মুগ্ধ করেন। ঠাকুরও তাঁকে গান শুনিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন।

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ অক্টোবর, কোজাগরী পূর্ণিমার পরদিন, নীলকণ্ঠ এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। বেলা তিনটে হবে। কিছু কথা বলার পর ঠাকুর ছোট তক্তাপোশের উপর নিজের আসনে গিয়ে বসলেন। নীলকণ্ঠকে বললেন, একটু মায়ের নাম শুনব। নীলকণ্ঠ তাঁর দল নিয়ে গান শুরু করলেন। তিনি সেদিন দুটি মাতৃসংগীত শুনিয়েছিলেন ঠাকুরকে। দ্বিতীয় গানটিতে নীলকণ্ঠ করলেন দেবী দুর্গার বন্দনা। নীলকণ্ঠ যখন গানটি গাইছেন, তখন গানটি শুনতে শুনতে শ্রীরামকৃষ্ণ উঠে দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। গানের মাঝেই তাঁর সমাধি ভঙ্গ হল। আরও কিছু গান ও কথার পর ঠাকুর নীলকণ্ঠকে বললেন, "... একটি

গান শোন।" ঠাকুর একটি আগমনী গান ধরেন—

"গিরি! গণেশ আমার শুভকারী।—
পূজে গণপতি, পেলাম হৈমবতী
যাও হে গিরিরাজ, আনো গিয়ে গৌরী।।
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন।
ঘরে আনবো চণ্ডী, শুনবো কত চণ্ডী,
কত আসবেন দণ্ডী, যোগী জটাধারী।।"

উপরোক্ত ঘটনায় লক্ষণীয় এই যে, দেবীপক্ষ শেষ হয়ে গেলেও ঠাকুর তখনও দেবীর ভাবে আবিষ্ট। তাই তিনি মা দুর্গার গান শুনে সমাধিস্থ হলেন আবার নিজে আগমনী গান শোনালেন।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ গলার ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। তখন থেকেই তাঁর কণ্ঠে দুর্গাসংগীত তথা সর্বপ্রকার ভক্তিসংগীত ক্রমশ স্তব্ধ হয়ে যায়।

জগন্মাতা দুর্গার প্রতি ঠাকুরের ছিল অবিচলিত শ্রদ্ধা, দুর্গা নাম ছিল তাঁর অটুট আস্থা। তাই আগমনী গান এবং দুর্গাসংগীত ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। আর সেটাই তো স্বাভাবিক কারণ তিনি নিজেই তো ছিলেন স্বয়ং দুর্গা।

এ প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দের বলা একটি ঘটনার কথা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। একদিন ঠাকুর পঞ্চবটীতে বসে আছেন, এমন সময় মা দুর্গা গঙ্গাবক্ষ থেকে উঠে তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন এবং কাছে এসে তাঁর দেহে মিলিয়ে গেলেন। ঠাকুর পরে হৃদয়কে ডেকে বলেছিলেন, "মা দুর্গা এসেছিলেন, এই দেখ মাটিতে তাঁর পদচিহ্ন রয়েছে।"

বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ফড়ফড় করে তর্ক করে। শেষ হলে চুপ হয়ে যায়। কলসী পূর্ণ হলে, কলসীর জল পুকুরের জল এক হলে আর শব্দ থাকে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয় ততক্ষণ শব্দ।

—শ্রীরামকৃষ্ণ

ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত

১। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র সাধনা
২। ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার
৩। কৃষ্টির দৃষ্টিতে
৪। জনশিক্ষায় সংস্কৃত
৫। জীবনবৃত্ত (আত্মজীবনী)
৬। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত (গদ্যে)

প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম

৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ফোন : ৯৮৩০১৪৩৯৮৯, ৮৬৯৭৩২১৪১৮

এক অলৌকিক আধ্যাত্মিক ভালবাসার বন্ধনে

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র সেন

মণীন্দ্রকুমার সরকার

["দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস সামান্য নহেন; এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে এত বড় লোক কেহ নাই। ইনি এত সুন্দর, এত অসাধারণ ব্যক্তি ইঁহাকে অতি সাবধানে সন্তর্পণে রাখতে হয়। অযত্ন করলে এঁর দেহ থাকবে না; যেমন সুন্দর মূল্যবান জিনিস গ্লাসকেসে রাখতে হয়।" —কেশবচন্দ্র সেন]

'শ্রীরামকৃষ্ণলীলা' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। কিন্তু নাটকের প্রথমদিকের অঙ্কগুলিতে দুই প্রধান পার্শ্ব চরিত্রাভিনেতার একজন ছিলেন মথুরানাথ বিশ্বাস এবং অপরজন ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন। আগে মথুর পরে কেশব।

পুণ্য বঙ্গভূমির হুগলি জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম কামারপুকুরের দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান নবীন যুবক গদাধর চট্টোপাধ্যায় ঘটনাচক্রে কলকাতার নিকটবর্তী দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। প্রথম দর্শনেই সুস্থ-সবল, সহজ-সরল, আত্মভোলা স্বভাব, সৌম্যকান্তি, সুদর্শন গদাধরের প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হলেন রানির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস। হয়তো বা যুবকের প্রতি কিছুটা অপত্য ভাবও প্রচ্ছন্ন ছিল মথুরের মনে। এ-কারণে তিনি বিশেষ আগ্রহ নিয়েই গদাধরকে মন্দিরে দেবীর সেবা-পূজার কাজে নিয়োগ করেছিলেন। পরে ধাপে ধাপে পূজারির গভীর ঈশ্বরানুরাগ, ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার লাভের জন্য দীর্ঘ প্রাণান্তকর সাধনা এবং এক-এক করে প্রতিটি দুস্তর সাধনায় সিদ্ধিলাভ প্রভৃতি অতি মানুষিক গুণাবলী প্রত্যক্ষ করে মথুরের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে ইনি এক অনন্যসাধারণ ঐশীশক্তিসম্পন্ন উচ্চকোটির সাধক। আরও কিছু পরে 'ইনি স্বয়ং ঈশ্বর' এ-বিশ্বাসও তাঁর মনে সুদৃঢ় হল এবং ততদিনে মা কালীর সামান্য বেতনভুক পূজারি 'ছোট ভট্টাচার্য'-এর ক্রমোত্তরণ ঘটল 'বাবা'য়। সর্বপ্রকার কৌলীন্যবর্জিত 'মূর্খোত্তম' গ্রাম্য যুবক গদাধরের অবতারবরিষ্ঠ পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণে রূপান্তরের ঘটনা যেমন বিস্ময়কর তেমনি রোমাঞ্চকর। জমিদার মথুরানাথ বিশ্বাসের আপন গুরু ও ইষ্টের প্রথমাবধি সর্বান্তকরণে সর্বতোভাবে লালন-পালন ও সেবা-পূজা করার দুর্লভ সুযোগলাভের ঘটনা ও বিশ্বের ধর্মেতিহাসে একান্তই নজিরবিহীন।

মথুর চলে গেলেন, এলেন কেশব—পাণ্ডিত্যে, বাগ্মিতায় ও লিখনপটুতায় সেকালের এক বিরল প্রতিভাধর বিরাট পুরুষ। ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট নেতা রূপেও তাঁর খ্যাতি দেশের সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে গেছে।

"কঠোর ত্যাগ, বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্যে শক্তিমান হইয়া এবং সকল মতের ও সকল পথের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তররাগ্যে যে পরম ঐশ্বর্য সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা বিশ্বের কল্যাণে বিতরণ করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন। প্রাণের কত কথা কাহার নিকট বলিবেন? ঈশ্বরীয় কথা সর্বক্ষণ বলিতে না পারিলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না, প্রাণ আকুলি-বিকুলি করে, জীবন অসহ্য হইয়া ওঠে। তিনি সত্যই কাঁদিতেন, ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিতেন—কৈ মনের মানুষ কে আছ? তোমরা এসো। তোমাদের অপেক্ষায় দুয়ার খুলে কতকাল ধরে বসে আছি। কে কোথায় আছ এসো।

লেখক—বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গ্রন্থকার।

আশ্চর্য হলেও সত্য, তাঁহার আহ্বানে প্রথম আসিলেন মূর্তিপূজা বিরোধী ব্রাহ্মসমাজের কুলপতি কেশবচন্দ্র সেন। লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে তিনিই প্রথম 'পরমহংস মহাশয়'কে শিক্ষিত সমাজের সহিত পরিচিত করাইলেন। তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকা Mirror, New Dispensation, সুলভ সমাচার, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতিতে এই মহাশক্তিসম্পন্ন পুরুষের অলৌকিক জীবনকথা প্রচারিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের নেতারা লিখিলেন, 'এই শুদ্ধসত্ত্ব' মহাপুরুষ হিন্দুধর্মের গভীরতা ও মাধুর্যের জীবন্ত বিগ্রহ। তিনি সম্পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় এবং দেহাত্মবোধবিরহিত। তিনি আত্মানন্দে বিভোর, ধর্মের সত্যানুভূতিতে পূর্ণ এবং স্বকীয় পবিত্রতায় দীপ্ত। ... অম্লান পবিত্রতা, অব্যক্ত দিব্যানন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত অসীম জ্ঞান, শিশুসুলভ প্রশান্তি, বিশ্বমানবপ্রীতি এবং সর্বোপরি ঐকান্তিক ভগবৎপ্রেম তাঁহার জীবনে চরিতার্থ হইয়াছে। ... আমাদের ধর্মজীবনের আদর্শ স্বতন্ত্র হইলেও যতদিন তিনি দেহে থাকিবেন, আমরা সানন্দে তাঁহার পাদমূলে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার পবিত্রতার উচ্চ আদর্শ, অসাংসারিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং ভগবৎ প্রেমোন্মাদনা শিক্ষা করিব।"

এখানে মনে রাখা দরকার যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনেক অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মতো ভিন্ন ভাবাদর্শের কেশবচন্দ্রকেও প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের পূর্বেই ভাবে দর্শন করেছিলেন। এটি অবশ্যই একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিরল ঘটনা। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ই আগস্ট অতীতের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেছেন : "কিরূপ লোক (ভক্ত) এখানে আসবে, আসবার আগে দেখিয়ে দেয়। বটতলা থেকে বকুলতলা পর্যন্ত চৈতন্যদেবের সংকীর্তনের দল দেখালে। তাতে বলরামকে দেখলাম—না হলে মিছরি এসব দেবে কে। আর এঁকে (শ্রীম-কে) দেখেছিলাম। কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে, তাকে দেখলাম। সমাধি অবস্থায় দেখলাম, কেশব সেন আর তার দল। এক ঘর লোক আমার সামনে বসে রয়েছে। কেশবকে দেখাচ্ছে যেন একটা ময়ূর তার পাখা বিস্তার করে বসে রয়েছে। পাখা অর্থাৎ দলবল। কেশবের মাথায় দেখলাম লালমণি। ওটি রজোগুণের চিহ্ন। কেশব শিষ্যদের বলছে—'ইনি কি বলছেন, তোমরা সব শোনো'।"

কেশবকে প্রথম চাক্ষুষ দেখার প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছেন : "বহু পূর্বে আমি একদিন বুধবারে জোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন দেখিলাম নব যুবক কেশবচন্দ্র বেদিতে বসে উপাসনা করিতেছেন। দুই পার্শ্বে শত শত উপাসক বসে আছেন। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম যে কেশবচন্দ্রের মনটা ব্রহ্মেতে মজে গেছে, তার ফাতনা ডুবেছে। সেইদিন হইতেই তাঁর প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।"

এদিন শুধু দর্শন হয়েছিল, আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। কিন্তু কেশবের প্রতি আকর্ষণ এত তীব্র হয়ে উঠল যে ঠাকুর একদিন তাঁর কলকাতার বাসভবনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেদিন দেখা হল না। কেশব তখন বেলঘরে তাঁর 'তপোবন' নামক আশ্রমে শিষ্যগণসহ সাধন-ভজনে ব্যাপৃত ছিলেন। অধৈর্য ঠাকুর পরদিনই ভাগ্নে হৃদয়কে নিয়ে গাড়ি করে বেলঘরে চলে গেলেন।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ' গ্রন্থে ওইদিনের সেই যুগান্তকারী ঘটনার বিবরণ দিয়ে লিখেছেন : "ঠাকুর কেশবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া থাক। ঐ দর্শন কিরূপ জানিতে বাসনা, সেইজন্য তোমাদিগের নিকটে আসিয়াছি।' ঐরূপে সৎ প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথার উত্তরে শ্রীযুক্ত কেশব কি বলিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর যে 'কে জানে কালী কেমন—ষড়দর্শনে না পায় দরশন' রূপ রামপ্রসাদী সঙ্গীতটি গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, একথা আমরা হৃদয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। ঠাকুরের ভাবাবস্থা দেখিয়া তখন কেশব প্রভৃতি সকলে উহাকে আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা বলিয়া মনে করেন নাই, ভাবিয়াছিলেন উহা মিথ্যা ভান যা মস্তিষ্কের বিকারপ্রসূত। সে যাহা হউক ... অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর এখন গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়সকল সামান্য সামান্য দৃষ্টান্ত সহায়ে এমন সরল ভাষায় বুঝাইতে লাগিলেন যে, সকলে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। স্নানাহারের সময় অতীত হইয়া ক্রমে পুনরায় উপাসনার সময় উপস্থিত হইতে বসিয়াছে সেকথা কাহারও মনে হইল না। ঠাকুর তাহাদিগের এইপ্রকার ভাব দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'গরুর পালে অন্য কোনো পশু আসিলে তাহারা তাহাকে গুঁতাইতে যায়, কিন্তু গরু আসিলে গা চাটাচাটি করে। আমাদের আজ সেইরূপ হইয়াছে।' অনন্তর কেশবকে সম্বোধন করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'তোমার ল্যাজ খসিয়াছে।' শ্রীযুক্ত কেশবের অনুচরবর্গ ঐ কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া যেন অসন্তুষ্ট হইয়াছে দেখিয়া ঠাকুর তখন ঐ কথার অর্থ বুঝাইয়া সকলকে মোহিত করিলেন। বলিলেন, 'দেখ, ব্যাঙাচির যতদিন ল্যাজ থাকে, ততদিন সে কেবল জলেই

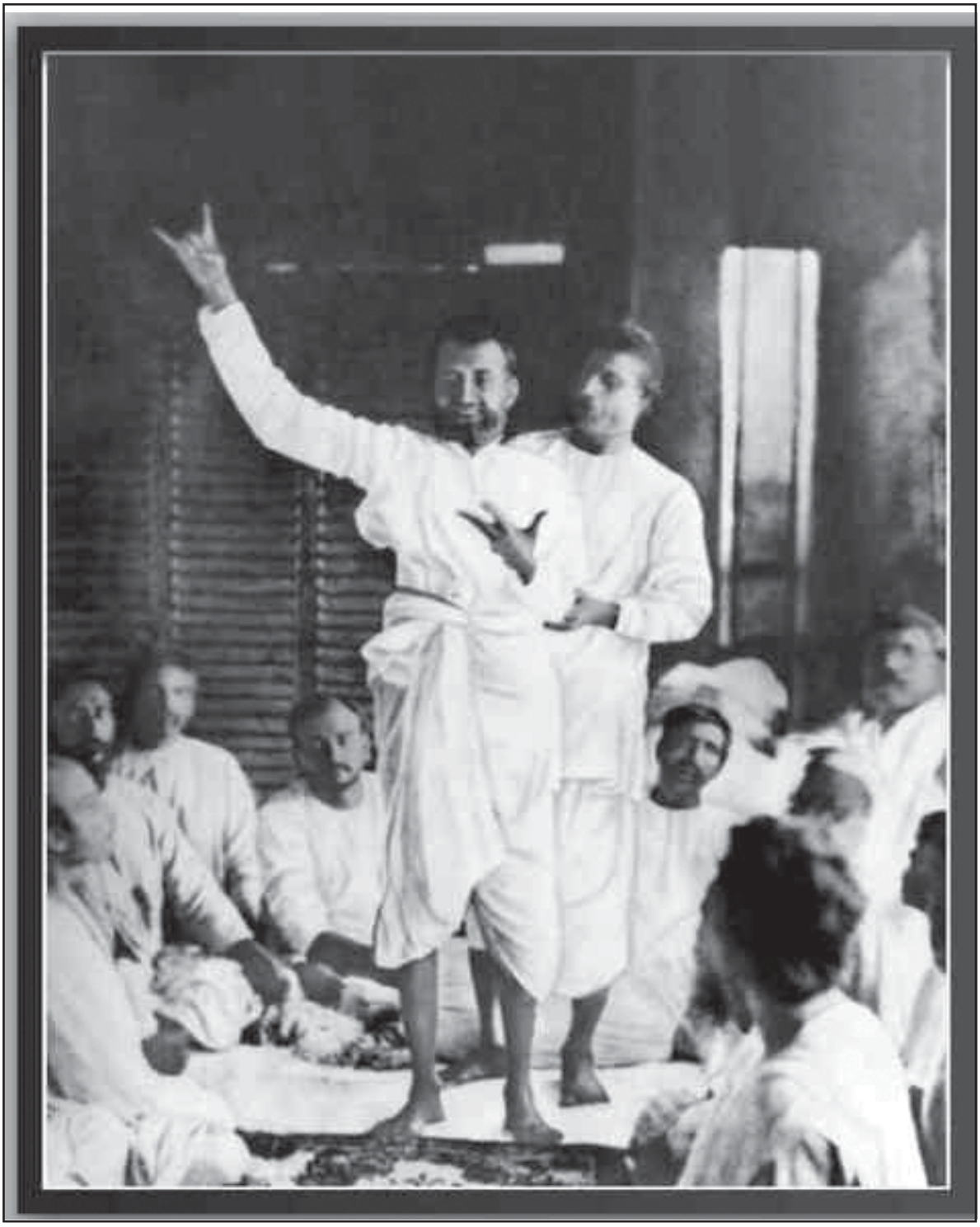

● সমাধিমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ। ভাগ্নে হৃদয়রাম ধরে আছেন।

থাকে, স্থলে উঠিতে পারে না, কিন্তু ল্যাজ যখন খসিয়া পড়ে তখন' জলেও থাকিতে পারে, ড্যাঙাতেও উঠিতে পারে, সেইরূপ মানুষের যতদিন অবিদ্যারূপ ল্যাজ থাকে, ততদিন সে কেবল সংসারজলেই থাকিতে পারে। ঐ ল্যাজ খসিয়া পড়লে সংসার এবং সচ্চিদানন্দ উভয় বিষয়েই ইচ্ছামতো বিচরণ করিতে পারে। কেশব, তোমার মন এখন ঐরূপ হইয়াছে, উহা সংসারেও থাকিতে পারে এবং সচ্চিদানন্দেও যাইতে পারে।' ঐরূপে নানা প্রসঙ্গে অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন। দেখা যায় ঠাকুর তাঁর অপূর্ব সম্মোহিনী শক্তিতে কেশব ও তাঁর শিষ্যদের এতটা মোহিত করে ফেলেছিলেন যে তাঁরা তাঁদের সময়জ্ঞান ও আহার-তৃষ্ণা বিস্মৃত হয়েছিলেন।

একদিনের কয়েক ঘণ্টা বাক্যালাপেই ঠাকুর ও কেশব উভয়ে পরস্পরকে একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন। কেশবকে দেখবার জন্য ঠাকুরের আকুলতা যতটা তীব্র ছিল, ঠাকুরকে দেখবার জন্য কেশবের ব্যগ্রতাও ছিল তদনুরূপ বা ততোধিক। ফলে কেশব প্রায়ই ঠাকুরের পুণ্য দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আগমন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে তাঁহার 'কমলকুটির' নামক বাটীতে লইয়া যাইয়া তাঁহার দিব্যসঙ্গ লাভে আপনাকে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করিতেন। ঠাকুর ও কেশবের সম্বন্ধ পরে এমন গভীরভাব ধারণ করিয়াছিল যে, পরস্পর পরস্পরকে কয়েকদিন দেখিতে না পাইলে উভয়েই বিশেষ অভাব বোধ করিতেন। তখন ঠাকুর কলিকাতায় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন অথবা শ্রীযুক্ত কেশব দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেন।"

তখনও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম কলকাতার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজে প্রচারলাভ করেনি। কেশব ও ঠাকুরের নিয়মিত ঘন ঘন মিলনের ফলে কেশব ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ও কথোপকথনের বিশদ বিবরণ তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন এবং এর দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে দেশবাসী সচেতন হয়ে উঠেন। বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের এই পরম আত্মীয় সম্পর্ক সুদূরপ্রসারী ফলপ্রসূ হয়েছিল। "কেশবচন্দ্রের ন্যায় বাগ্মী, মনীষী এবং প্রতিভাবান ব্রাহ্ম আচার্যকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে 'নিরক্ষর পাগলা বামুনের' সমীপে সমাগত এবং শ্রদ্ধাভরে তাঁহার কথামৃত পান করিতে দেখিয়া এবং তৎসহ প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্রাহ্ম নেতৃবর্গকেও দেখিয়া তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের প্রৌঢ় ও যুবকগণ প্রথমত স্তম্ভিত হইলেন এবং তৎপরে মহাজনগণের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া তাঁহারাও দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া মিলিত হইলেন। মহামায়ার বিচিত্র লীলা। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিষবৃক্ষে অমৃত ফল ফলিতে লাগিল।"

ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে দেখতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন দুই বিপরীত মেরুর অধিবাসী। কাজেই তাঁদের দুজনের এই অসম মিলন ও হার্দিক সম্পর্ক সেকালের বিদগ্ধ মহলের অনেকের মনেই বিস্ময় ও কৌতূহলের সঞ্চার করেছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে শ্রীম লিখেছেন : "কেশব তাঁহার সাধু চরিত্রে ও বক্তৃতাবলে মাস্টারের ন্যায় অনেক বঙ্গীয় যুবকের মন হরণ করিয়াছেন। অনেকেই তাঁহাকে পরম আত্মীয়বোধে হৃদয়ের ভালবাসা দিয়াছেন। কেশব ইংরাজি পড়া লোক, ইংরাজি দর্শন সাহিত্য পড়িয়াছেন। তিনি আবার দেবদেবী পূজাকে অনেকবার পৌত্তলিকতা বলিয়াছেন। এইরূপ লোক শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন, আবার মাঝে মাঝে দর্শন করিতে আসেন; ইহা বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। তাহাদের মনের মিল কোনখানে বা কেমন করিয়া হইল—এ রহস্যভেদ করিতে মাস্টারাদি অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন।"

"তাঁহাদের মনের মিল কোনখানে বা কেমন করিয়া হইল"—এ রহস্যের সমাধান রয়েছে ঠাকুরেরই কথায়—'গরুর পালে গরু আসিলে গা চাটাচাটি করে।' গরুর গাত্রবর্ণ বা আকার-আয়তন ভিন্ন হলেও এক প্রজাতির পশু। তাঁদের মনের মিল এখানেই। ঈশ্বরভাবনায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র ছিলেন সহযাত্রী।

'মাস্টারাদি'র কৌতূহলের কতক জবাব পাওয়া যায় কেশবচন্দ্র সেনের বিশেষ অনুগত ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের লেখায়। তিনি লিখেছেন : "সেই অসাধারণ মানুষটি যখনই যেখানে যান সেখানেই নিজের চারপাশে এক জ্যোতির্ময় পরিবেশ সৃষ্টি করেন। আমার মন এখনো সেই জ্যোতির্মণ্ডলে ভাসমান। তাঁর সঙ্গে যখনই সাক্ষাৎ হয়েছে তখনই অনুভব করেছি, এক রহস্যময় অবর্ণনীয় করুণ রস যেন তাঁর মধ্য থেকে উৎসারিত হয়ে আমার ভিতরে প্রবাহিত হচ্ছে। এই প্রবাহের সম্মোহ থেকে আমার মন আজও মুক্ত হতে পারেনি। তাঁর ও আমার মধ্যে সাদৃশ্যের ক্ষেত্রটি কোথায়? আমি একজন ইউরোপীয় ভাবাপন্ন সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত, আত্মকেন্দ্রিক, অর্ধ সংশয়বাদী, তথাকথিত শিক্ষিত যুক্তিবাদী। আর তিনি? তিনি একজন দরিদ্র, নিরক্ষর, শীর্ণ-বিবর্ণ, সংস্কৃতিহীন, রোগগ্রস্ত, অর্ধনগ্ন, অর্ধ পৌত্তলিক, নির্বান্ধব হিন্দু ভক্ত। তাঁর কথা শোনবার জন্য কেন তবে

আমাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর কাছে বসে কাটাতে হয়? —যে আমি কিনা ডিজরেলি, ফসেট, স্ট্যানলি, ম্যাক্সমুলার সহ বিপুল সংখ্যক বিদগ্ধ ব্যক্তি ও ধর্মবিদের কথা শুনেছি। আমি খ্রিস্টের একাগ্র ভক্ত ও অনুগামী, উদারচেতা খ্রিস্টিয় মিশনারি ও প্রচারকদের একজন গুণগ্রাহী বন্ধু এবং যুক্তিবাদী ব্রাহ্মসমাজের একজন একান্ত অনুগত কর্মী। তবে কেন আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কথা শুনি? কেবল আমি নই, আমার মতো অনেকে এরকম করে থাকেন। অনেকেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে পরীক্ষা করেছেন। দলে দলে মানুষ গেছে তাঁকে দর্শন করতে এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলতে।"

কেশবচন্দ্র সেনের গুণমুগ্ধ অপর এক ভক্ত গিরিশচন্দ্র সেন লিখেছেন : "পরম ধার্মিক মহা পণ্ডিত জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেই নিরক্ষর পরমহংসের নিকট শিষ্যের ন্যায়, কনিষ্ঠের ন্যায় বিনীতভাবে এক পার্শ্বে বসিতেন, আদর ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সকল কথা শ্রবণ করিতেন, কোনোদিন কোনো রূপ তর্ক-বিতর্ক করিতেন না। পরমহংসের জীবনের মূল্যবান জিনিস সকল বেশ করিয়া আপন জীবনে আয়ত্ত ও আদর করিতেন। সাধু-ভক্তি কিরূপে করিতে হয়, সাধু হইতে সাধুতা কিভাবে গ্রহণ করিতে হয় কেশবচন্দ্র দেখাইয়া গিয়াছেন।"

ঠাকুর নিজেও তাঁর প্রতি কেশবের শিষ্যসুলভ বিনয় ও আনুগত্যের এক মনোরম বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "দেখ, কেশব এও পণ্ডিত, ইংরাজিতে লেকচার দিত, কত লোকে তাকে মানত, স্বয়ং কুইন ভিক্টোরিয়া তার সঙ্গে বসে কথা করেছে। সে কিন্তু এখানে যখন আসত, শুধু গায়ে, সাধু দর্শন করতে হলে হাতে কিছু আনতে হয়। তাই ফল হাতে করে আসত। একেবারে অভিমানশূন্য।"

সুযোগ পেলে অনুগত সেবকের মতো কেশব ঠাকুরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে তৃপ্তিলাভ করতেন। কথামৃতে এরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ আছে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ৩রা ডিসেম্বর ঠাকুর ভক্ত মনোমোহনের বাটী এসেছেন। কেশবও উপস্থিত ছিলেন। নানা সৎপ্রসঙ্গ ও কীর্তনানন্দের পর "শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু খাইতে চাহিলেন। ভিতর হইতে একটি থালা করিয়া মিষ্টান্নাদি আসিল। কেশব ওই থালাখানা ধরিয়া রহিলেন, ঠাকুর খাইতে লাগিলেন। কেশব জলপাত্রও ওইরূপ ধরিলেন। গামছা দিয়া মুখ মুছাইয়া দিলেন। তৎপর ব্যজন করিতে লাগিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র—এই দুই যুগন্ধর মহাপুরুষের মহামিলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে কেশবের অপর এক অনুরাগী শিষ্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল লিখেছেন : "সাধুরাই সুপ্ত এবং গুপ্ত সাধুদিগকে জগতের সম্মুখে বাহির করিয়া থাকেন। কেশবচন্দ্র যেমন বর্তমান সময়ে শিক্ষিত ধর্মপিপাসু নব্যদলের সহিত ঈশা, মুসা, গৌর, শাক্য, সক্রেটিস, মহম্মদের পরিচয় করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের মনে সাধুভক্তির সঞ্চার করিয়াছেন, তেমনি পরমহংসকে তিনিই যুবকবৃন্দের নিকট ডাকিয়া আনিয়াছেন। এই দুই মহাত্মার ধর্মভাবের বিনিময়ে ব্রাহ্মসমাজে ভক্তি বিষয়ে অনেক উন্নতি হইয়াছে। কেশব যাহার ভিতরে ভাল সামগ্রী যাহা কিছু পান তাহা শোষণ করিয়া লন। অবিকল প্রতিলিপির ন্যায় তাঁহার অনুকরণ ছিল না। অন্যের ভাব লইয়া তিনি তাহাকে নতুন আকার প্রদান করিতেন এবং এক গুণ ভাবকে দশগুণ করিয়া তুলিতে পারিতেন। পরমহংসদেবের সরল মধুর বাল্যভাব কেশবের যোগ, বৈরাগ্য, নীতি, ভক্তি ও বিশুদ্ধ ধর্মজ্ঞানকে অনুরঞ্জিত করিল। ব্রাহ্মসমাজে এক্ষণে যে ভক্তি লীলাবিলাস ও মাতৃভাবের প্রকাশ দেখা যাইতেছে তাহার প্রধান সহায় পরমহংস রামকৃষ্ণ। তিনি শিশু বালকের মতো মা আনন্দময়ীর সহিত যেমন কথা কহেন এবং হরিলীলার তরঙ্গে ভাসিয়া যেমন নৃত্য-কীর্তন করেন, শেষ জীবনে কেশব অবিকল তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। মাতৃভাবের সাধন, সহজ প্রচলিত ভাষায় উপাসনা প্রার্থনা, ইদানীং তিনি যাহা করিতেন তাহা যে উক্ত মহাত্মার সহিত যোগের ফল একথা অনেকেই জানেন। কিন্তু কেশব ভিন্ন কয় ব্যক্তি সে ভাবের অনুকরণ করিতে পারিয়াছে? এই প্রেমযোগের কিছু অংশ সকলেই পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতো কেহই আদায় করিতে পারেন নাই। আবার কেশবচন্দ্রের প্রভাবও পরমহংস মহাশয়ের ধর্মজীবনকে অনেক বিষয়ে পরিমার্জিত, পরিশোধিত করিয়া দিয়াছে। তিনি মনুষ্যের স্বাধীনতা, দায়িত্ব এবং সংসারী লোকের ভক্তি-বৈরাগ্য উপার্জনের সম্ভানীয়তা স্বীকার করিতেন না। ধর্মপ্রচারের প্রস্তাব শুনিলে বলিতেন, 'সেসব ঐ আধারে' অর্থাৎ সেজন্য কেশবই আছেন। ... এক্ষণে তিনি অসাম্প্রদায়িকভাবে ব্রাহ্মসমাজের একজন সহায়করূপে কার্য করিতেন। উভয়ের যোগে ধর্মজগৎ অনেক বিষয়ে উপকৃত হইয়াছে। হিন্দুধর্মের শাখা-প্রশাখার মধ্যে যে সকল আধ্যাত্মিক মধুর ভাব আছে তাহা বিধানবিশ্বাসীদিগের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যে ধর্ম একসময় নিতান্ত কঠোর নীরস ছিল, এইরূপে তাহা সরস এবং অত্যন্ত সরল হইল। কোথায় বৈদান্তিক জ্ঞান বিচার, আর কোথায় মাতার সঙ্গে শিশুর কথোপকথন। আরাধনা, প্রার্থনায় গ্রাম্য কথার চলন এইসময়

● ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

হইতে আরম্ভ হইয়াছে।"

রামকৃষ্ণগত প্রাণ কেশবের আর এক স্মরণীয় কীর্তি হল তিনিই প্রথম পরমহংসদেবের আলোকচিত্র গ্রহণের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর ঠাকুর কেশবের আমন্ত্রণে তাঁর কমল কুটিরে আগমন করেন। সঙ্গে ছিলেন ভাগ্নে হৃদয়। সেদিন "সংকীর্তন শ্রবণে শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্য আনন্দে আত্মহারা হন। অতঃপর তিনি ওঁ-কার ধ্বনি করতে করতে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলনপূর্বক সহসা দণ্ডায়মান হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত বাহ্য চেতনা বিলুপ্ত হয় এবং তিনি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হন। তাঁর বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য নিস্পন্দ নিথর দেহখানি পাছে ভূতলে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় তাঁর ভাগিনেয় ও সেবক হৃদয়রাম তৎক্ষণাৎ ঐ অবস্থায় তাঁকে সন্তর্পণে ধারণ করেন। ঐরূপ ভাবাবস্থায় দণ্ডায়মান হওয়ার সময় তাঁর বাম স্কন্ধস্থিত সুবিন্যস্ত বস্ত্রাঞ্চলটি ভূলুণ্ঠিত হয়। হৃদয় উহা সযত্নে কটিদেশে বেঁধে দেন। এই মুহূর্তে কেশবচন্দ্র তাঁর ঐ অপরূপ নয়নাভিরাম মূর্তির ফটোগ্রাফ তুলিয়ে নেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের পরস্পর সাক্ষাৎকারের অনেক মাধুর্যমণ্ডিত, আবেগঘন ও হাস্যকৌতুকরঞ্জিত ঘটনা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের পাতায় পাতায় বর্ণিত আছে। এক্ষণে আমরা তার কয়েকটা চয়ন করে পাঠকের তৃপ্তার্থে পরিবেশন করছি।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বেলঘরের তপোবনে প্রথম আলাপ- পরিচয়ের পর "দক্ষিণেশ্বরে, কমলকুটিরে, ব্রাহ্মসমাজ ইত্যাদি স্থানে অনেকবার ঠাকুর কথাচ্ছলে তাঁহাকে (কেশবকে) উপদেশ দিয়াছিলেন, 'নানা পথ দিয়া নানা ধর্মের ভিতর দিয়া ঈশ্বরলাভ হতে পারে। মাঝে মাঝে নির্জনে সাধন-ভজন করে ভক্তিলাভ করে সংসারে থাকা যায়, জনকাদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে সংসারে ছিলেন; ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়, তবে দেখা দেন, তোমরা যা কর, নিরাকার সাধন, সে খুব ভাল। ব্রহ্মজ্ঞান হলে ঠিক বোধ করবে—ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। সনাতন হিন্দুধর্মে সাকার নিরাকার দুই মানে, নানা ভাবে ঈশ্বরের পূজা করে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। রোশনচৌকিওয়ালারা একজন শুধু পোঁ ধরে বাজায় অথচ তার বাঁশীতে সাত ফোকর আছে; কিন্তু আর একজন, তারও সাত ফোকর আছে, সে নানা রাগরাগিণী বাজায়।

"তোমরা সাকার মানো না, তাতে কিছু ক্ষতি নাই, নিরাকারে নিষ্ঠা থাকলেই হল। তবে সাকারবাদীদের টানটুকু নেবে। মা বলে তাঁকে ডাকলে ভক্তি-প্রেম আরও বাড়বে।... বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে এক ঈশ্বরেরই কথা আছে ও তাঁহার লীলার কথা; জ্ঞান, ভক্তি দুই আছে। সংসারে দাসীর মতো থাকবে; দাসী সব কাজ করে, কিন্তু দেশে মন পড়ে আছে। মনিবের ছেলেদের মানুষ করে; বলে 'আমার হরি', 'আমার রাম', কিন্তু জানে ছেলে আমার নয়। তোমরা যে নির্জনে সাধন করছ, এ খুব ভাল, তাঁর কৃপা হবে।"

কেশবচন্দ্র তাঁর মিরর সংবাদপত্রে (২৮ মার্চ, ১৮৭৫) লিখেছেন : "আমরা অল্পদিন হইল দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসকে বেলঘরের বাগানে দর্শন করিয়াছি। তাঁহার গভীরতা, অন্তর্দৃষ্টি,

বালকস্বভাব দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি শান্ত স্বভাব, কোমল প্রকৃতি, আর দেখিলে বোধ হয় সর্বদা যোগেতে আছেন। এখন আমাদের বোধ হইতেছে যে, হিন্দুধর্মের গভীরতম প্রদেশ অনুসন্ধান করিলে কত সৌন্দর্য, সত্য সাধুতা দেখিতে পাওয়া যায়। তা না হইলে পরমহংসের ন্যায় ঈশ্বরীয় ভাবে ভাবিত যোগী পুরুষ কিরূপে দেখা যাইতেছে?"

একদিন গ্রীষ্মকালে রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্র কমলকুটিরে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, ঠাকুরকে তিনি কিরূপ মনে করেন। উত্তরে কেশব বলেন : "দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস সামান্য নহেন; এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে এত বড় লোক কেহ নাই। ইনি এত সুন্দর, এত অসাধারণ ব্যক্তি ইঁহাকে অতি সাবধানে সন্তর্পণে রাখতে হয়। অযত্ন করলে এঁর দেহ থাকবে না; যেমন সুন্দর মূল্যবান জিনিস গ্লাসকেসে রাখতে হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণের বরিষ্ঠতা বিষয়ে এমন বিশেষজ্ঞচিত মূল্যায়ন একমাত্র ব্রহ্মপুরুষ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব!

সাধারণ সমাজিকতা রক্ষার ব্যাপারেও ঠাকুরের প্রতি কেশবের গভীর ভক্তি-ভালবাসা ও আত্মীয়তাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে এক অনুষ্ঠানে রাজেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে ঠাকুর এবং কেশব দুজনেই আমন্ত্রিত ছিলেন। ঠাকুরের আগমন নিশ্চিত হলেও কেশবের আগমন বিষয়ে কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, কারণ কেশবের তখন ভ্রাতৃবিয়োগে অশৌচ ছিল। কথাটা কানে যেতেই কেশব বিস্মিত হয়ে বললেন : "সে কি? পরমহংস মহাশয় আসিবেন, আর আমি যাইব না। অবশ্যই যাইব। অশৌচ তাই আমি আলাদা জায়গায় খাব।"

কেশবচন্দ্রের দেহত্যাগের পর অতীত দিনের স্মৃতিচারণ করে ঠাকুর একদিন (১৮৮৪, ২৪শে মে) বলেন : "আচ্ছা, কেশব সেন খুব আসত। এখানে এসে অনেক বদলে গেল। ইদানীং খুব লোক হয়েছিল। এখানে অনেকবার এসেছিল দলবল নিয়ে, আবার একলা একলা আসবার ইচ্ছা ছিল।"

"কেশবের আগে তেমন সাধুসঙ্গ হয় নাই। কলুটোলার বাড়িতে দেখা হল; হৃদে সঙ্গে ছিল। কেশব সেন যে ঘরে ছিল, সেই ঘরে আমাদের বসালে। টেবিলে কি লিখছিল, অনেকক্ষণ পরে কলম ছেড়ে কেদারা থেকে নেমে বসল, তা আমাদের নমস্কার-টমস্কার করা নাই।"

"এখানে মাঝে মাঝে আসত। আমি একদিন ভাবাবস্থাতে বললাম, সাধুর সম্মুখে পা তুলতে নাই। ওতে রজোগুণ বৃদ্ধি হয়। তারা এলেই আমি নমস্কার করতুম, তখন ওরা ক্রমে ভূমিষ্ঠ হয়ে নমস্কার করতে শিখলে। আর কেশবকে বললাম, "তোমরা হরিনাম করো, কলিতে তাঁর নাম-গুণকীর্তন করতে হয়। তখন তারা খোল-করতাল নিয়ে হরিনাম ধরলে।"

"কেশবকে মাঝে মাঝে বলতাম, তোমরা যাঁকে ব্রহ্ম বলো, তাঁকেই আমি শক্তি, আদ্যাশক্তি বলি। যখন বাক্য-মনের অতীত, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, তখন বেদে তাঁকে ব্রহ্ম বলেছে। যখন দেখি যে তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন তখন তাঁকে শক্তি, আদ্যাশক্তি— এইসব বলি।"

"কেশব একদিন এসেছিল; সন্ধ্যার পর ঘাটে উপাসনা করলে। উপাসনার পর আমি কেশবকে বললুম, দেখ, ভগবানই এক রূপে ভাগবত হয়েছেন, তাই বেদ, পুরাণ, তন্ত্র—এসব পূজা করতে হয়। আবার এক রূপে তিনি ভক্ত হয়েছেন, ভক্তের হৃদয় তাঁর বৈঠকখানা; বৈঠকখানায় গেলে যেমন বাবুকে অনায়াসে দেখা যায়। তাই ভক্তের পূজাতে ভগবানের পূজা হয়।

"কেশব আর তার দলের লোকগুলি এই কথাগুলি খুব মন দিয়ে শুনলে। পূর্ণিমা, চারদিকে চাঁদের আলোক। গঙ্গাকূলে সিঁড়ির চাতালে সকলে বসে আছে। আমি বললাম, সকলে বল, 'ভাগবত-ভক্ত-ভগবান' তখন সকলে একসুরে বললে, 'ভাগবত-ভক্ত-ভগবান'। আবার বললাম, বল, 'ব্রহ্মই শক্তি, শক্তিই ব্রহ্ম'। তারা আবার এক সুরে বললে, 'ব্রহ্মই শক্তি, শক্তিই ব্রহ্ম।' তাদের বললাম, যাঁকে তোমরা ব্রহ্ম বল, তাঁকেই আমি মা বলি; মা বড় মধুর নাম।

"যখন আবার তাদের বললাম, আবার বল, 'গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব', তখন কেশব বললে, মহাশয়, অতদূর নয়। তাহলে সকলে আমাদের গোঁড়া বৈষ্ণব মনে করবে।"

দেখতে দেখতে রাত দশটা হয়ে গেল। কেশবের ভক্তদের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও আর কেউ কেউ বললেন, 'আজ থেকে যাব, সব বটতলায় (পঞ্চবটীতে) বসে; কেশব কিন্তু বললেন, 'না, কাজ আছে, যেতে হবে।' ঠাকুর বললেন, কেন? আঁশচুপড়ির গন্ধ না হলে কি ঘুম হবে না

তখন ঠাকুর হাসতে হাসতে 'আঁশচুপড়ি ও মেছুনী'র গল্প শোনালেন : "একজন মেছুনী মালীর বাড়িতে অতিথি হয়েছিল; মাছ বিক্রি করে আসছে; চুপড়ি হাতে আছে। তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়া হল। অনেক রাত পর্যন্ত ফুলের গন্ধে ঘুম

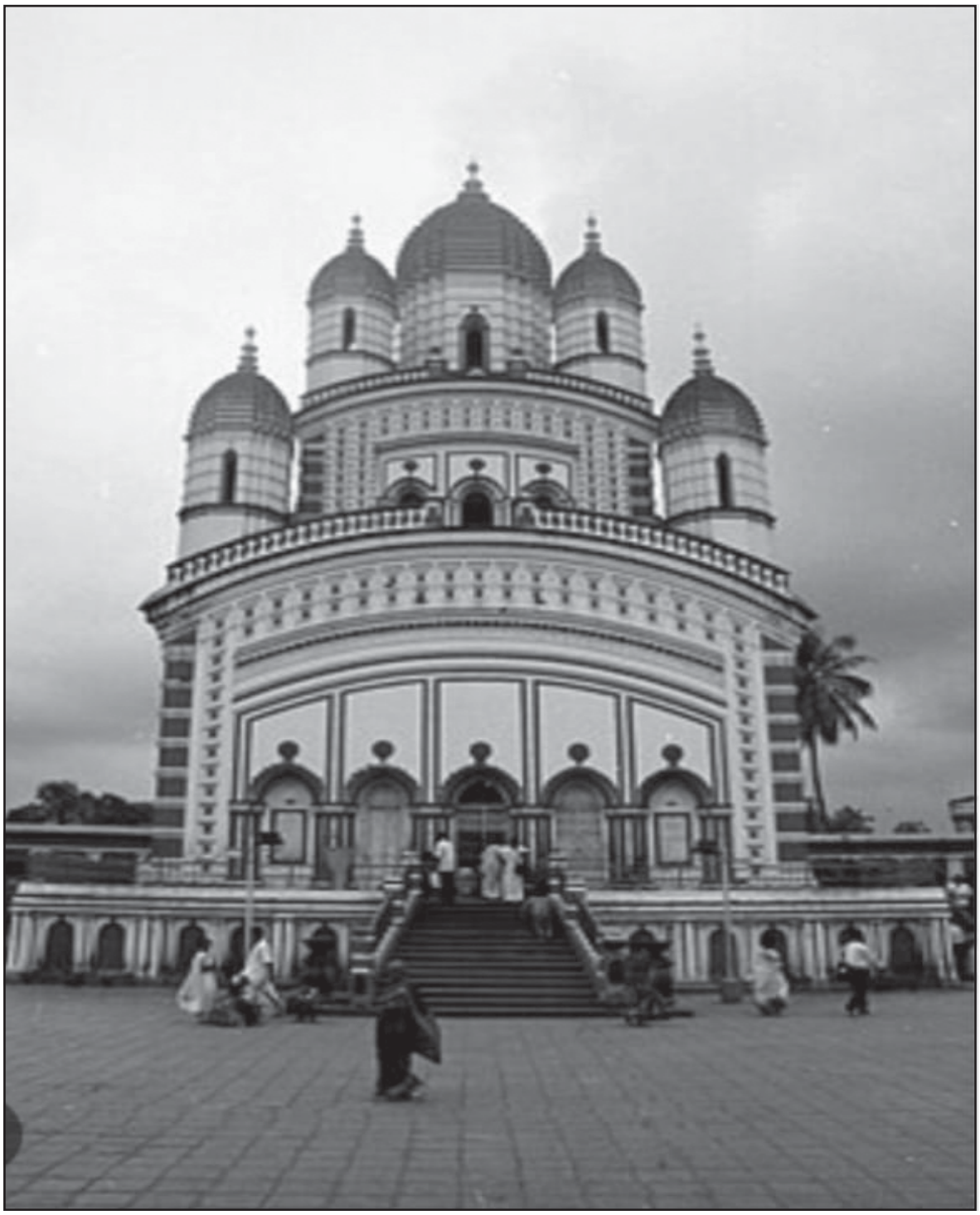

● দক্ষিণেশ্বর মন্দির।

হচ্ছে না; বাড়ির গিন্নি সেই অবস্থা দেখে বললে, কিরে, তুই ছটফট করছিস কেন? সে বললে, কে জানে বাবু, বুঝি এই ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না; আমার আঁশচুপড়িটা আনিয়ে দিতে পার? তাহলে বোধ হয় ঘুম হতে পারে। শেষে আঁশচুপড়ি আনাতে জল ছিটে দিয়ে নাকের কাছে রেখে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোতে লাগল।" গল্প শুনে কেশবের দলের লোকেরা হো-হো করে হাসতে লাগল।

ভাবগাম্ভীর্যে ঘনীভূত ঈশ্বরীয় আলোচনাকে হাস্যকৌতুকের কুশলী প্রয়োগে এমন তরলীকরণের অনায়াস দক্ষতা শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোনো অবতারপুরুষের ছিল কিনা আমাদের জানা নেই। নরেন্দ্রাদি বালক ভক্তদের সঙ্গে তাঁর ফস্টি-নস্টি করার স্বভাব অবশ্য সুবিদিত।

২রা এপ্রিল, ১৮৮২, বিকাল পাঁচটায় ঠাকুর হঠাৎই কেশবের কমলকুটিরে এসে উপস্থিত হলেন। কেশব তখন এক বন্ধুর গৃহে যাবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। খবর পেয়ে বেরিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন। বন্ধুর গৃহে আর যাওয়া হল না। সদানন্দ ঠাকুর কেশবকে বললেন : "তোমার অনেক কাজ, আবার খপরের কাগজে লিখতে হয়, সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যাবার অবসর নাই; তাই আমিই তোমায় দেখতে এসেছি। তোমার অসুখ শুনে ডাব-চিনি মেনেছিলুম; মাকে বললুম, 'মা, কেশবের যদি কিছু হয়, তা হলে কলিকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কইব'।"

ঠাকুরের আকুতিভরা কথাগুলি শুনে কেশব ও উপস্থিত সকলের মন্য আর্দ্র হয়ে উঠল। কথামৃতকার শ্রীম লিখেছেন, "শ্রীযুক্ত কেশবকে ঠাকুর স্নেহপূর্ণ নয়নে দেখিতেছেন। যেন কত আপনার লোক; আর যেন ভয় করিতেছেন, কেশব পাছে অন্য কারু, অর্থাৎ সংসারের না হয়েন! তাঁহার দিকে তাকাইয়া গান ধরিলেন :

কথা বলতে ডরাই; না বললেও ডরাই।
মনের সন্দ হয়; পাছে তো মা ধনে হারাই হারাই।।
আমরা জানি যে মন-তোর; দিলাম তোরে সেই মন্তোর।
এখন মন তোর; যে মন্ত্রে বিপদেতে তরী তরাই।"

'আমরা জানি যে মন-তোর; দিলাম তোরে সেই মন্তোর; এখন মন তোর।' অর্থাৎ সব ত্যাগ করে ভগবানকে ডাক,—তিনিই সত্য, আর সব অনিত্য; তাঁকে না লাভ করলে কিছুই হল না। এই মহামন্ত্র।

ওই বছরে ২৭ অক্টোবর ছিল আর একটা উল্লেখযোগ্য দিন। এদিন বেলা ৪টায় কেশব জাহাজে করে দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর লোকজন এসে ঠাকুরকে পরম সমাদরে জাহাজে তুলে নিলেন। কোজাগরী পূর্ণিমার দীপ্ত চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত গঙ্গাবক্ষে ঠাকুর অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন এবং সারাক্ষণ একান্ত প্রিয়জন জ্ঞানে কেশবাদি ব্রাহ্ম-ভক্তদের নানা উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম কথা—এক ঈশ্বর, তাঁর ভিন্ন ভিন্ন নাম। "জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলে। একই ব্রাহ্মণ। যখন পূজা করে, তার নাম পূজারী, যখন রাঁধে তখন রাঁধুনি বামুন। যে জ্ঞানী জ্ঞানযোগ ধরে আছে, সে নেতি নেতি এই বিচার করে। ব্রহ্ম এ নয়, ও নয়, জীব নয়, জগৎ নয়। বিচার করতে করতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। নাম-রূপ এসব স্বপ্নবৎ। ব্রহ্ম কি যে, তা মুখে বলা যায় না। তিনি যে ব্যক্তি তাও বলবার জো নাই।

"জ্ঞানীরা ওইরূপ বলে—যেমন বেদান্তবাদীরা। ভক্তেরা কিন্তু সব অবস্থাই লয়। জাগ্রত অবস্থাও সত্য বলে—জগৎকে স্বপ্নবৎ বলে না। ভক্তেরা বলে, এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য। আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, পর্বত, সমুদ্র, জীব-জন্তু—এসব ঈশ্বর করেছেন। তাঁরই ঐশ্বর্য। তিনি অন্তরে হৃদয় মধ্যে আবার বাহিরে। উত্তম ভক্ত বলে, তিনি নিজে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—জীবজগৎ হয়েছেন। ভক্তের সাধ সে চিনি খায়, চিনি হতে ভালবাসে না।

"ভক্তের ভাব কিরূপ জানো? হে ভগবান, 'তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস', 'তুমি মা, আমি তোমার সন্তান', আবার 'তুমি আমার পিতা বা মাতা', 'তুমি পূর্ণ, আমি তোমার অংশ', ভক্ত এমন কথা বলতে ইচ্ছা করে না যে 'আমি ব্রহ্ম'।

"যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করতে চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির করতে চেষ্টা করে। তাই প্রথম অবস্থায় নির্জনে স্থির আসনে অনন্যমন হয়ে ধ্যান চিন্তা করে।

"কিন্তু একই বস্তু। নামভেদ মাত্র। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান।"

অপূর্ব এক মিলনোৎসব। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবানের অভেদ তত্ত্ব কেশবাদি ভক্তগণ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছেন। সকলেই বুঝি বাহ্যজ্ঞানরহিত।

পরের প্রসঙ্গ বেদ ও তন্ত্রের সমন্বয় এবং ব্রহ্ম ও শক্তির অভিন্নতা। ঠাকুর অমৃতময়ী ভাষায় বলে চলেছেন : "বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীব-জগৎ—এসব শক্তির খেলা। বিচার করতে গেলে এসব স্বপ্নবৎ। ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু; শক্তিও স্বপ্নবৎ অবস্তু। কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার জো নাই। 'আমি ধ্যান করছি', 'আমি চিন্তা করছি'—এসব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে। তাই ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। এককে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন, অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি,—অগ্নি মানলেই দাহিকা শক্তি মানতে হয়, দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না। আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকা শক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না। সূর্যের রশ্মি ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না।

"আদ্যাশক্তি লীলাময়ী, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোনো কাজ করছেন না—এই যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এইসব কার্য করেন তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি নাম-রূপ ভেদ।"

এইভাবে ঠাকুর একের পর এক সৎ প্রসঙ্গ করে চলেছেন। মাঝে মাঝে আবার আবহাওয়াকে একঘেয়েমি মুক্ত করার জন্য রঙ্গরসেরও অবতারণা করছেন। তার মধ্যেও তাঁর দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

জাহাজে বিজয় গোস্বামীও ছিলেন। একসময় তিনি কেশবের নব বিধান ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধেয় আচার্য ছিলেন। সম্প্রতি তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটেছে। সে কারণে দুজনেরই সঙ্কুচিত ভাব। তা দেখে, উভয়ের মধ্যে ভাব করাবার চেষ্টায় ঠাকুর কেশবকেই বলছেন—"ওগো! এই বিজয় এসেছেন। তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ যেন শিব ও রামের যুদ্ধ। রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হল, দুজনের ভাবও হল। কিন্তু শিবের ভূত-প্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো —ওদের ঝগড়া কিচকিচি আর মিটে না।" ঠাকুরের কথায় শ্রোতারা হেসে উঠলেন। বক্তা ঠাকুর যেমন অক্লান্ত, শ্রোতারাও তেমনি অভিভূত। "তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন, —সহাস্য বদন, আনন্দময়, প্রেমানুরঞ্জিত নয়ন, প্রিয়দর্শন অদ্ভুত এক যোগী! তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন, সর্বত্যাগী একজন প্রেমিক বৈরাগী। ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না।"

খ্রিস্টানদের মতো ব্রাহ্মরাও পাপবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ঠাকুর এসবের বিরোধী ছিলেন। ব্রাহ্মদের প্রতি তাঁর উপদেশ ছিল : "মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ, সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কী? আমি ঈশ্বরের সন্তান, রাজাধিরাজের ছেলে, আমায় আবার বাঁধে কে? যদি সাপে কামড়ায়, 'বিষ নাই' জোর করে বললে বিষ ছেড়ে যায়। তেমনি 'আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত' এই কথাটি রোখ করে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়।"

এরপর ঠাকুর কেশবকেই বললেন : "তোমাদের ব্রাহ্মসমাজে ও কেবল 'পাপ'। যে ব্যক্তি রাতদিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' এই করে, সে তাই হয়ে যায়। ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই 'কি, আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে। আমার আবার পাপ কি। আমার আবার বন্ধন কি!' ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ-মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়। কেবল 'পাপ' আর 'নরক' এইসব কথা কেন? একবার বল যে, অন্যায় কর্ম যা করেছি আর করব না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর।"

কেশবের ভক্তেরা তাঁকে রাজা জনকের সঙ্গে তুলনা করবেন। এ কথা ভেবেই হয়তো ঠাকুর এদিন জনকের প্রসঙ্গ তুললেন, বললেন : "সংসারে ঈশ্বর লাভ হবে না কেন? জনকের হয়েছিল। ... কিন্তু ফস করে জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা নির্জনে অনেক তপস্যা করেছিলেন। সংসারে থেকেও এক-একবার নির্জনে বাস করতে হয়। সংসারের বাইরে একলা গিয়ে যদি ভগবানের জন্য তিন দিনও কাঁদা যায় সেও ভাল। এমনকি অবসর পেয়ে একদিনও নির্জনে তাঁর চিন্তা যদি করা যায় সেও ভাল। লোকে মাগছেলের জন্য এক ঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে বল? ... রোগটি হচ্ছে বিকার। আবার যে ঘরে বিকারের রোগী, সেই ঘরে জলের জালা আর আচার তেঁতুল। যদি বিকারের রোগী আরাম করতে চাও, ঘর থেকে ঠাঁইনাড়া করতে হবে। সংসারী জীব বিকারের রোগী, বিষয়—জলের জালা, বিষয়ভোগ তৃষ্ণা—জল তৃষ্ণা। আচার তেঁতুল মনে করলেই মুখে জল সরে, কাছে আনতে হয় না, এইরূপ জিনিসও ঘরে আছে, ঘোষিৎ সঙ্গ। তাই নির্জনে চিকিৎসা দরকার।"

এ সময় ব্রাহ্মসমাজে গুরুগিরি নিয়ে বিরোধ শুরু হয়েছে। কেশবের অনেক ভক্ত তাঁকে ছেড়ে গেছেন। এ কারণেই ঠাকুর তাঁকে সতর্ক করার ছলে বলছেন : "তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য কর না, তাই এইরূপ ভেঙে যায়। মানুষগুলি দেখতে সব

একরকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারু ভিতর সত্ত্বগুণ বেশি, কারু রজোগুণ বেশি, কারু তমোগুণ। পুলিগুলি দেখতে একরকম। কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর, কারু ভিতর নারিকেলের ছাঁই, কারু ভিতর কলায়ের পোর। আমার কি ভাব জানো? আমার সন্তান ভাব। মানুষ গুরু মেলে লাখ লাখ। সকলেই গুরু হতে চায়। শিষ্য কে হতে চায়? লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন আর আদেশ দেন তাহলে হতে পারে। নারদ, শুকদেবাদির আদেশ হয়েছিল। শঙ্করের আদেশ হয়েছিল। আদেশ না হলে কে তোমার কথা শুনবে? ... আবার মনে মনে আদেশ হলে হয় না। তিনি সত্য সত্যই সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন। তখন আদেশ হতে পারে। সে কথার জোর কত? পর্বত টলে যায়। শুধু লেকচার? দিনকতক লোক শুনবে, তার পর ভুলে যাবে। কথা অনুসারে সে কাজ করবে না।"

সেদিনের জলযান বিহারে শেষ আলোচনা ছিল কর্মযোগ বিষয়ে। ঠাকুর কেশবকে বললেন : "তোমরা বল 'জগতের উপকার করা'। জগৎ কি এতটুকু গা। আর তুমি কে যে জগতের উপকার করবে? তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎ কর। তাঁকে লাভ কর। তিনি শক্তি দিলে তবে সকলের হিত করতে পার; নচেৎ নয়। ... কর্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে কর্ম করতে বলেছে, কলিকালে করা বড় কঠিন। অন্নগত প্রাণ। বেশি কর্ম চলে না। ... কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নাম-গুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তিযোগই যুগধর্ম। তোমাদেরও ভক্তিযোগ, তোমরা হরিনাম কর, মায়ের নাম-গুণগান কর, তোমরা ধন্য। তোমাদের ভাবটি বেশ। বেদান্তবাদীদের মতো তোমরা জগতকে স্বপ্নবৎ বল না। এরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা নও, তোমরা ভক্ত। তোমরা ঈশ্বরকে ব্যক্তি বল, এও বেশ। তোমরা ভক্ত, ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁকে অবশ্য পাবে।"

জাহাজ ভ্রমণ শেষ হল। ঠাকুরকে সযত্নে জাহাজ থেকে নামানো হল। বাহিরে এসে সকলে দেখেন 'কোজাগরের পূর্ণচন্দ্র হাসছে। ভাগীরথী বক্ষ কৌমুদীর লীলাভূমি হয়েছে।' ঠাকুরের জন্য গাড়ি আনা হল। তিনি গাড়িতে উঠলেন। কেশব ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলেন।

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য নিয়ে ব্রাহ্মদের বাড়াবাড়িও ছিল ঠাকুরের অপছন্দ। পরদিন ২৮ অক্টোবর সিঁথির ব্রাহ্মসমাজে এসে ঠাকুর শিবনাথ প্রমুখ ব্রাহ্মভক্তদের বলেন, "হ্যাঁ গা, তোমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য অত বর্ণনা কর কেন? আমি কেশব সেনকে ওই কথা বলেছিলাম। একদিন তারা সব ওখানে (কালীবাড়িতে) গিছিল। আমি বললুম, তোমরা কিরকম লেকচার দাও, আমি শুনব। তা গঙ্গার ঘাটের চাঁদনিতে সভা হল, আর কেশব বলতে লাগল। বেশ বললে। আমার ভাব হয়ে গিছিল। পরে কেশবকে আমি বললুম, তুমি এগুলো এত বল কেন? —'হে ঈশ্বর, তুমি কি সুন্দর ফুল করিয়াছ, তুমি আকাশ করিয়াছ, তুমি তারা করিয়াছ, তুমি সমুদ্র করিয়াছ—এইসব?' যারা নিজে ঐশ্বর্য ভালবাসে তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা করতে ভালবাসে। যখন রাধাকান্তের গয়না চুরি গেল, সেজোবাবু রাধাকান্তের মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে বলতে লাগল, 'ছি ঠাকুর! তুমি তোমার গয়না রক্ষা করতে পারলে না?' আমি সেজোবাবুকে বললাম, 'তোমার কি বুদ্ধি! স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর দাসী, পদসেবা করেন, তাঁর কি ঐশ্বর্যের অভাব। এ গয়না তোমার পক্ষেই ভারী একটা জিনিস; কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে কতকগুলো মাটির ড্যালা। ছি! অমন হীন বুদ্ধির কথা বলতে নাই, কি ঐশ্বর্য তুমি তাঁকে দিতে পার?' তাই বলি, যাঁকে নিয়ে আনন্দ হয় তাঁকেই লোকে চায়; তার বাড়ি কোথায়, ক'খানা বাড়ি, ক'টা বাগান, কত ধনজন, দাস-দাসী এ খবরে কাজ কি? নরেন্দ্রকে যখন দেখি, তখন আমি সব ভুলে যাই। তার কোথা বাড়ি, তার বাবা কি করে, তার ক'টা ভাই এসব কথা একদিন ভুলেও জিজ্ঞাসা করি নাই। ঈশ্বরের মাধুর্যরসে ডুবে যাও। তাঁর অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত ঐশ্বর্য। অত খবরে আমাদের কাজ কি!"

ঠাকুরের কেশবের অসুখ। সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। অনেকে মনে করছেন, এবার বোধহয় বাঁচবার সম্ভাবনা নেই। ঠাকুর খবর পেয়ে স্বজনবিয়োগের আশঙ্কায় কমলকুটিরে এসেছেন তাঁকে দেখতে। দিনটা ছিল ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩। সময় বিকাল প্রায় পাঁচটা। কেশবের লোকজন পরম সমাদরে ঠাকুরকে বৈঠকখানায় নিয়ে বসালেন। খানিকক্ষণ বসে থেকেও কেশব না আসায় ঠাকুর অধৈর্য হয়ে বললেন, "হ্যাঁ গা, তাঁর আসবার কি দরকার? আমিই ভিতরে যাই না কেন?" একজন ভক্ত বিনীতভাবে বললেন, "আজ্ঞে, আর একটু পরেই তিনি আসছেন।" একটু অপেক্ষা করে ঠাকুর আবার বললেন, "যাও, তোমরাই এমন করছ। আমিই ভিতরে যাই।" ভক্তটি তাড়াতাড়ি ঠাকুরকে ভুলাবার জন্য কেশবের গল্প বলতে লাগলেন, "তাঁর অবস্থা আর একরকম হয়ে গেছে। আপনারই মতো মা'র সঙ্গে কথা কন। মা কি বলেন শুনে হাসেন কাঁদেন।"

"কেশব জগতের মা'র সঙ্গে কথা কন, হাসেন কাঁদেন—এই কথাগুলি শুনিবা মাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দেখিতে

দেখিতে সমাধিস্থ।" এদিকে সন্ধ্যা হয়েছে, ঘরে আলো জ্বলছে।" ঠাকুর ভাবাবস্থায় আপনা আপনি বলিতেছেন—দেহ আর আত্মা। দেহ হয়েছে আবার যাবে। আত্মার মৃত্যু নাই। যেমন সুপারি; পাকা সুপারি ছাল থেকে আলাদা হয়ে থাকে, কাঁচাবেলায় ফল আলাদা আর ছাল আলাদা করা বড় শক্ত। তাঁকে দর্শন করলে, তাঁকে লাভ করলে দেহ বুদ্ধি যায়। তখন দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা বোধ হয়।"

এবার কেশব ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁহ দেহ অস্থিচর্মসার। তিনি দাঁড়াতে পারছেন না, দেয়াল ধরে ধরে অনেক কষ্টে এসে ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। ঠাকুর তখনও ভাবে গরগর মাতোয়ারা। আপনা-আপনি অনেক কথা বলে যাচ্ছেন। কেশব উচ্চৈঃস্বরে বলছেন,'আমি এসেছি' 'আমি এসেছি'। এই বলে ঠাকুরের বাম হাত ধারণ করে সেই হাতে হাত বুলাতে লাগলেন।

এতক্ষণে ঠাকুর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন, দৃষ্টি রাখলেন কেশবের দেহের উপর। কিন্তু আশ্চর্য! কেশবের শরীর-স্বাস্থ্য বা কুশল বিষয়ে একবারও একটা কথা বললেন না। অনেকক্ষণ ধরে অনেক ঈশ্বরীয় কথা বললেন। ভগ্নস্বাস্থ্য কেশব ও অন্য সকলে স্তব্ধ হয়ে সেসব কথা শুনলেন। অবশেষে ঠাকুর কেশবকে সহাস্যে বললেন : "তোমার অসুখ হয়েছে কেন তার মানে আছে। শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গেছে, তাই ওরকম হয়েছে। যখন ভাব হয় তখন কিছু বোঝা যায় না, অনেকদিন পরে শরীরে আঘাত লাগে। আমি দেখেছি, বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে চলে গেল, তখন কিছু টের পাওয়া গেল না, ওমা! খানিকক্ষণ পরে দেখি কিনারার উপর জল ধপাস ধপাস করছে আর তোলপাড় করে দিচ্ছে। হয়তো কিনারার খানিকটা ভেঙে জলে পড়ল। কুঁড়েঘরে হাতি প্রবেশ করলে তোলপাড় করে ভেঙেচুরে দেয়। ভাবহস্তী দেহ-ঘরে প্রবেশ করে আর তোলপাড় করে। হয় কি জান? আগুন লাগলে কতকগুলো জিনিস পুড়িয়ে-চুড়িয়ে ফেলে, আর একটা হইহই কাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। জ্ঞানাগ্নি প্রথমে কাম-ক্রোধ এইসব রিপু নাশ করে, তারপর অহংবুদ্ধি নাশ করে। তারপর একটা তোলপাড় আরম্ভ করে। তুমি মনে কচ্ছো সব ফুরিয়ে গেল। কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু বাকি থাকে তিনি ছাড়বেন না। হাসপাতালে যদি তুমি নাম লেখাও, আর চলে আসবার জো নাই। যতক্ষণ রোগের একটু কসুর থাকে ততক্ষণ ডাক্তার সাহেব চলে আসতে দেবে না। তুমি নাম লেখালে কেন।"

কেশব হাসপাতালের কথা শুনে হাসছেন, হাসি সংবরণ করতে পারছেন না। থাকেন থাকেন, আবার হাসেন। ঠাকুর বলেই চলেছেন; "শিশির পাবে বলে মালী বসরাই গোলাপের শিকড়শুদ্ধ তুলে দেয়। শিশির পেলে গাছ ভাল করে গজাবে। তাই বুঝি তোমার শিকড়শুদ্ধ তুলে দিচ্ছে। ফিরে ফিরতি বুঝি একটা বড় কাণ্ড হবে।"

এবার ঠাকুর ও কেশব দুজনেই হেসে উঠলেন। কেশবকে ঠাকুরের শেষ উপদেশ : "বাড়ির ভিতরে অত থেকো না। মেয়েছেলেদের মধ্যে থাকলে আরও ডুববে। ঈশ্বরীয় কথা হলে আরও ভাল থাকবে।"

এসময় কেশবের গর্ভধারিণী এসে ঘরের প্রবেশপথে দাঁড়ালেন এবং তাঁর হয়ে একজন ঠাকুরকে বললেন, "মা বলছেন, কেশবকে আশীর্বাদ করুন।" ঠাকুর গম্ভীর স্বরে বললেন, "আমার কি সাধ্য। তিনিই আশীর্বাদ করবেন। 'তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি'। ঈশ্বর দুইবার হাসেন। একবার হাসেন যখন দুই ভাই জমিবখরা করে আর দড়ি মেপে বলে, 'এদিকটা আমার, ওদিকটা তোমার।' ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন, আমার জগৎ, তার খানিকটা মাটি নিয়ে করছে, এদিকটা আমার ওদিকটা তোমার। ঈশ্বর আর একবার হাসেন। ছেলের অসুখ সঙ্কটাপন্ন। মা কাঁদছেন। বৈদ্য বলছে, 'ভয় কি মা, আমি ভাল করব।' বৈদ্য জানে না ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে।"

"ঠাকুর থামলেন। একঘর লোক, সকলেই বাক্যহারা স্তব্ধ। 'ঠিক এসময় কেশব অনেকক্ষণ ধরিয়া কাশিতে লাগিলেন। সে কাশি আর থামিতেছে না। সে কাশির শব্দ শুনিয়া সকলেরই কষ্ট হইতেছে। অনেকক্ষণ পরে ও অনেক কষ্টের পর কাশি একটু বন্ধ হইল। কেশব আর থাকিতে পারিতেছেন না। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া অনেক কষ্টে দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া নিজের কামরায় পুনরায় গমন করিলেন।"

ঠাকুরের কেশব চলে গেলেন। তাঁর প্রয়াণে সংসার বিবাগী, ব্রহ্মবিজ্ঞানী, স্থিতপ্রজ্ঞ নির্মম-নির্মোহ ঠাকুরের হৃদয়েও যে কতটা বেদনা ও শূন্যতার সঞ্চার হয়েছে, তার পরিমাপ দূরের কথা সামান্য আভাস দানও আমাদের সাধ্যাতীত। কাজেই সেই নিষ্ফল প্রয়াস থেকে বিরত থেকে আমরা এক্ষণে ঠাকুর ও কেশব উভয়ের বিশেষ অনুরাগী কয়েকজনের লিখিত বিবরণ পাঠক-পাঠিকার সামনে উপস্থাপন করছি।

প্রিয়নাথ মল্লিক ছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের অনুরক্ত শিষ্য ও নববিধান ব্রাহ্মসমাজের একজন শ্রদ্ধেয় আচার্য। তিনি লিখেছেন,

কেশবের মহাপ্রয়াণের পর শ্রীরামকৃষ্ণ শিশুর মতো কেঁদেছিলেন। তিনি কেশবের মা'র সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন, "ধন্য সেই গর্ভ যে গর্ভ এমন অপূর্ব সন্তানের জন্ম দিয়েছিল। তাঁর জীবন থেকে পুরুষ পরম্পরায় মানুষ উপকৃত হবে।"

কেশবের অপর এক শিষ্য গিরিশচন্দ্র সেন লিখেছেন : "আচার্যদেবের স্বর্গারোহণ সংবাদ শুনিয়া পরমহংস শোকাকুল হন, তিনি বলেন, 'কেশবচন্দ্র চলে যাওয়াতে আমার জীবনের অর্ধেক চলে গিয়েছে। কেশব প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ন্যায় ছিলেন, শতসহস্র লোক তাঁহার আশ্রয় পেয়ে শীতল হত। সেরূপ বৃক্ষ আর কোথায়? আমরা সুপারি গাছ তালগাছের মতো; শীতল ছায়াদানে একটি লোককেও তৃপ্ত করিতে পারি না।"

ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য ও লীলাপার্ষদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখেছেন, "শ্রীযুক্ত কেশবের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা কতদূর গভীর ছিল, তাহা আমরা ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কেশবের শরীর রক্ষার পর ঠাকুরের আচরণে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি তিনদিন শয্যাত্যাগ করিতে পারি নাই। মনে হইয়াছিল একটা অঙ্গ (পক্ষাঘাতে) পড়িয়া গিয়াছে।"

"All Power is within you,
You can do anything and everything"
—Swami Vivekananda

JMT

SHISHU SAHITYA BHARATI

19, SHYAMA CHARAN DEY STREET, KOLKATA-700 073
Phone : (033) 2241-7703 / 9830355391 / 8013438798

বিশেষ দ্রষ্টব্য

'তত্ত্বমসি' পত্রিকার নবীকরণ বা গ্রাহক চাঁদা Online-এ পাঠালে এই Bank Account-এ পাঠাবেন।

Bank Name : **Central Bank of India**
SB A/c. No. : 1 5 3 6 1 5 7 7 7 3
Branch Payable : Barrackpore Branch Code : 1090
IFSC Code : CBIN0281090

Cheque should be drawn in favour of **Ramakrishna Vivekananda Mission (Tattwamasi)** of Rs. 200/- only for one year subscription, Rs. 3,500 only for Life Membership.

Send Subscription to **The Editor, Tattwamasi, Ramakrishna Vivekananda Mission, 7 Riverside Road, Barrackpore, Kolkata-700 120** । টাকা পাঠানোর পর পত্রিকা অফিসে ফোন করে জানাতে হবে। **ফোন নম্বর : ২৫৯৪-৭৬৪৫ / মোবাইল : ৯৩৩০৩১৮৩৬৭ (সময় : ১১টা থেকে ৫টা, রবিবার বন্ধ)।** —সম্পাদক

সংঘজননী মা সারদা

স্বামী নিত্যানন্দ

বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে ১৮৮৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর শ্রীসারদাদেবী জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতা শ্যামাসুন্দরীদেবী।

সারদা ছিলেন পিতামাতার জ্যেষ্ঠা কন্যা। তাঁর প্রথম নামকরণ হয়েছিল 'ঠাকুরমণি'। দরিদ্র হলেও রামচন্দ্র ছিলেন স্পষ্টবক্তা, সত্যবাদী ও ধর্মপ্রাণ। সাংসারিক অভাব-অনটনের মধ্যে সারদা ছোট ভাই-বোনদের দেখাশুনা করতেন। এই সময় সম্বন্ধে শ্রীমা তাঁর এক ভক্তকে বলেছিলেন, "দ্যাখ বাবা, আমার যখন খুব কম বয়স, সে সময় আমি একলা থেকে যখন যে কাজ করতুম, ঠিক আমারই মতন আর একটি মেয়েও সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজ করত-হাসত, তামাসা করত। কিন্তু অন্য লোক এলেই আর তাকে পেতুম না। দশ-এগারো বছর পর্যন্ত এরকম হয়েছিল।"

সেই সময় মেয়েদের লেখাপড়ার রেওয়াজ ছিল না। পাঠশালায় যাওয়া তো চিন্তার বাইরে। পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন কেউ চাইতেন না মেয়েরা বাড়ির বাইরে গিয়ে পড়াশুনা করুক। পুরুষশাসিত সমাজে সারদাদেবীরও অক্ষরজ্ঞান হল না। যাত্রা, কবিগান ইত্যাদি শুনে শুনে পুরাণ, শাস্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে অতি ছোট বয়স থেকেই তাঁর কিছুটা জ্ঞান হতে আরম্ভ করে।

কামারপুকুর গ্রামের চব্বিশ বছরের যুবক গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মাত্র ছয় বছরের মেয়ে সারদার বিয়ে দিলেন পিতা রামচন্দ্র। গদাধরের বিয়ের ব্যাপারে তাঁর দাদা রামেশ্বর অনেক জায়গায় অনেক মেয়ে দেখেছেন, কিন্তু সুপাত্রী মিলছে না। গদাধর একদিন তাঁর দাদাকে বললেন—"পাত্রীর জন্য এখানে-ওখানে খুঁজছ কেন? জয়রামবাটীতে গিয়ে দেখ। রামচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়িতে আমার জন্য কুটো বাঁধা হয়ে আছে।"

বিয়ের পর গদাধর প্রায় দু'বছর কামারপুকুরে ছিলেন। সারদার বয়স তখন আট বছর। গদাধর দক্ষিণেশ্বরে চলে এসে সংসারের সমস্ত বিষয় ভুলে গিয়ে সাধনার সমুদ্রে ডুবে যান। সারদা আরও কয়েকদিন কামারপুকুরে থেকে নিজগৃহে জয়রামবাটীতে ফিরে যান। ১৮৬৭ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে সঙ্গে করে কামারপুকুরে আসেন সেই সময় সারদাকে তাঁর পিতৃগৃহ থেকে নিয়ে আসা হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। এই সময় ঠাকুর সারদাকে শেখালেন যে মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরে নিজেকে একেবারে সমর্পণ করা। এই শিক্ষা সম্বন্ধে পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীমা বলেছেন—"হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে—ঐকাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম। সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।" (লীলাপ্রসঙ্গ)

১৮৭২ সালের মার্চ মাসের পূর্ণিমায় প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মতিথিতে গঙ্গাস্নান করার জন্য কিছু প্রতিবেশী ও দূর সম্পর্কের আত্মীয়রা কলকাতায় আসছেন শুনে সারদাদেবীও তাঁদের সঙ্গে আসার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন। পিতা রামচন্দ্র নিজে তাঁকে নিয়ে কলকাতার দিকে রওনা দিলেন। পথিমধ্যে সারদা দেবীর ধূম জ্বর দেখা দিল। এ অবস্থায় আর এগিয়ে যাওয়া ঠিক নয় ভেবে রামচন্দ্র মেয়েকে নিয়ে একটা চটির মধ্যে আশ্রয় নিলেন। অন্য সঙ্গীরা রওনা হয়ে গেলেন। জ্বরে যখন একেবারে বেহুঁশ, তখন সারদা দেখলেন, পাশে একটি মেয়ে এসে বসল। মেয়েটির রঙ কালো, কিন্তু ভারী সুন্দরী। বসে তাঁর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। এমন নরম ঠাণ্ডা হাত, গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে যেতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোথা থেকে আসছ গা?' মেয়েটি বলল, 'আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।' শুনে অবাক হয়ে বললেন, 'দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বর যাব, তাঁকে দেখব,

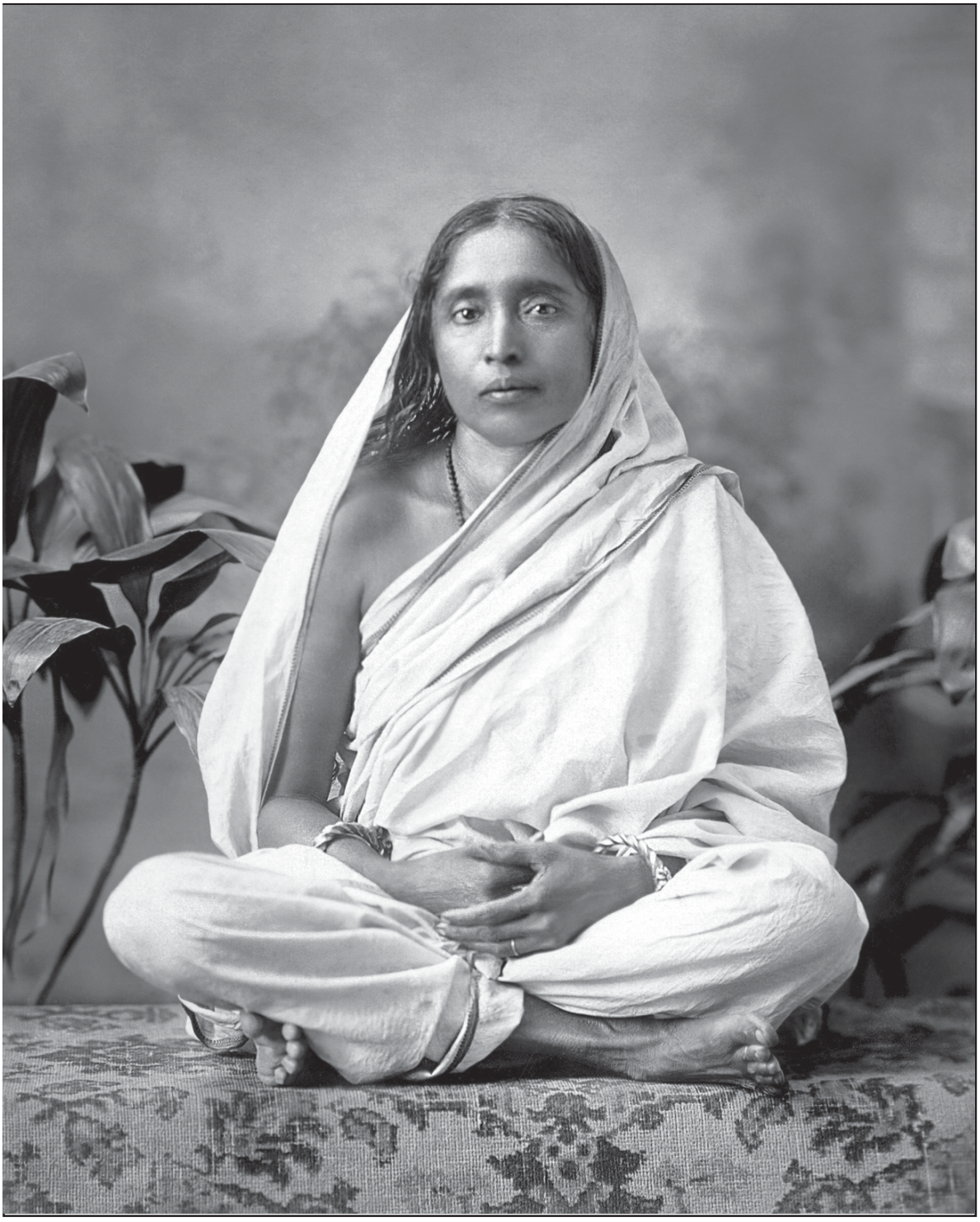

● সংঘজননী মা সারদা।

তাঁর সেবা করব। কিন্তু পথে জ্বর হওয়ায় আমার ভাগ্যে ঐসব আর হল না।' মেয়েটি বলল, 'সে কি! তুমি দক্ষিণেশ্বর যাবে বইকি। ভালো হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।' সারদা বললেন, 'বটে? তুমি আমার কে হও গা?' মেয়েটি বলল, 'আমি তোমার বোন হই।' সারদা বললেন, 'বটে? তাই তুমি এসেছ।' এরপর সারদা ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভোরের মধ্যে তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল। রাত ন'টার সময় তাঁরা দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছালেন। ঠাকুর তাঁকে দুর্বল দেখে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করলেন।

নহবতে থাকার ব্যবস্থা করার আগে সারদাদেবী বেশ কয়েকমাস ঠাকুরের সঙ্গেই থাকতেন। তখন ঠাকুরের ঘন ঘন সমাধি হত। বিভিন্ন প্রকারের সমাধি অবস্থায় তা ভাঙাবার জন্য কোন নাম ও বীজ শোনাতে হবে তা তাঁকে শিখিয়েছেন। এইসময় ঠাকুর শ্রীমাকে সাক্ষাৎ ষোড়শী জ্ঞানে পূজা করেন। এই পূজাটি হয় ১৮৭২ সালের ৫ই জুন। সেদিন ছিল ফলহারিণী কালীপূজার দিন। দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে যখন সকলে পূজায় ব্যস্ত তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজের ঘরে এই পূজার আয়োজন করেন। রাত নটা নাগাদ আয়োজন শেষ হওয়ার পর শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের ঘরে আসেন। ঠাকুর তাঁকে আলপনা দেওয়া একটি পিঁড়িতে উত্তর দিকে মুখ করে বসতে বললেন। "সম্মুখস্থ কলসের মন্ত্রপূত বারি দ্বারা ঠাকুর বারংবার শ্রীশ্রীমাকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করিলেন। অনন্তর মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া তিনি এমন প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—'হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইঁহার (শ্রীশ্রীমা'র) শরীর মনকে পবিত্র করিয়া ইঁহাতে আবির্ভূত হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।" (লীলাপ্রসঙ্গ)

এরপর ঠাকুর দেবীজ্ঞানে তাঁকে পূজা করলেন। ভোগ নিবেদন করে তা থেকে খানিকটা নিয়ে নিজেই তা খাইয়ে দিলেন।

সমস্ত ঘটনা ঘটে যাবার পর শ্রীশ্রীমা'র জ্ঞান হল; তিনিও ঠাকুরকে মনে মনে প্রণাম করে আবার নহবতে ফিরে গেলেন। এই নহবত ঘরে শ্রীমা প্রায় দশ-বারো বছর ছিলেন। খুব কষ্ট হলেও তিনি ওই ছোট ঘরে থাকতে খুব পছন্দও করতেন। এই ঘরে থাকাকালীন তাঁর অনেকবার ভাবসমাধি হয়।

মাঝে মাঝে তিনি জয়রামবাটী ও কামারপুকুরে যেতেন। সেখানে কয়েক মাস থাকার পর আবার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসতেন। এইরকম একবার দক্ষিণেশ্বরে আসার সময় সঙ্গীদের হাঁটার সঙ্গে তাল রাখতে না পারায় সারদা পথ হারিয়ে ফেললেন। এদিকে সন্ধে হয়ে যায়। কী করবেন ভাবতে ভাবতে অন্ধকারের মধ্যে হেঁটে চলেছেন। হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে একটি স্বাস্থ্যবান লোক বিরাট লাঠি হাতে নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াল। সারদা ঘাবড়ে না গিয়ে বলেন, "বাবা, আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গিয়েছে, আমি পথ হারিয়েছি। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন। আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি।" ঠিক, এই সময় লোকটির স্ত্রী হাজির হওয়ায় সারদা তাকে বলেন—"মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা। কী বিপদেই পড়েছিলুম মা, যদি বাবা ও তুমি না এসে পড়তে।" তারা ছিল জাতিতে বাগদী। পেশা ডাকাতি। সারদা 'বাবা-মা' সম্বোধন করায় তাদের দু'জনের মন গলে গেল। তারা বলে—"তুমি তো সাধারণ মেয়ে নও গো—আমরা তোমার মধ্যে কালী-মাকে দেখলুম যে।" তারা সেই রাতের মতো তাঁকে নিরাপদ স্থানে রেখে এবং রাতে খাবারের ব্যবস্থাও করে।

পরের দিন ভোরবেলা দুজনে সারদাকে নিয়ে রওনা হয়ে তারকেশ্বরে পৌঁছে দেয়। সেখানে আসার পরেই শ্রীমা তাঁর সাথীদের সঙ্গে মিলিত হন।

শ্রীমা জয়রামবাটীতেই হোক, কামারপুকুরেই হোক, আর দক্ষিণেশ্বরেই হোক, যেখানেই থাকতেন সেখানে প্রায় সমস্ত কাজের দায়িত্ব নিজেই নিয়ে যেতেন। এই অভ্যাসটি তাঁর অতি ছোটবেলা থেকেই হয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরে আসার পরেও প্রথমে শাশুড়ি ঠাকরুণের সেবা করা, পরে স্বামীর সেবা করা, তাঁর স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখা ইত্যাদি সবই তিনি করতেন। এছাড়া ঠাকুরের অগণিত ভক্ত-শিষ্যদের আবদারও তিনি হাসিমুখে সামলাতেন। কাউকে কোনোদিন তিনি কড়া কথা বলেননি। এতসব কাজের মধ্যেও তাঁর দেবসেবায় কোনো ত্রুটি ছিল না। রাত থাকতে উঠে গঙ্গাস্নান করে জপতপ করতেন।

শ্রীশ্রীমা যে কে ছিলেন তা আজও রহস্যাবৃত। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের পরিচয় দু'-চার কথায় দিয়েছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমা? অবশ্য ঠাকুর শ্রীমা সম্বন্ধে বলেছেন—'ও আমার শক্তি' অর্থাৎ ঠাকুরের জীবনে তিনি ছিলেন সীতা ও রাধা। আবার বলেছেন—'ও (শ্রীমা) সারদা—সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।'

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বজয় করে যেদিন মাকে প্রণাম করতে গেলেন সেদিন সেই ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় প্রত্যক্ষদর্শী কুমুদবন্ধু সেনের লেখা থেকে। সেটা এইরকম—"মা তাঁর

ঘরের দরজার সর্বাঙ্গে চাদর ঢেকে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। স্বামীজি তাঁর সামনে এসেই সোজা মাটিতে শুয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।... কিন্তু সাধারণ নীতি অনুযায়ী তাঁর পাদস্পর্শ করলেন না। তারপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে উপস্থিত আমরা যারা স্বামীজির পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম তাদের কোমল কণ্ঠে বললেন, "যাও, মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর। কিন্তু চরণ স্পর্শ করো না। তাঁর এতই করুণা, এতই কোমল তাঁর প্রকৃতি, এতই তিনি স্নেহময়ী যে যখন কেউ তাঁর পাদস্পর্শ করে, তিনি তার সর্বগ্রাসী করুণা, সীমাহীন ভালোবাসা এবং সমবেদনার দ্বারা তৎক্ষণাৎ তার যাবতীয় দুঃখকষ্ট নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে নেন। তার ফলে তাঁকে নীরবে অপরের জন্য কষ্টভোগ করতে হয়। ধীরে ধীরে একে একে তাঁর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হও। মুখে কিছু না বলে তোমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নীরবে তাঁর কাছে সর্বান্তকরণে প্রার্থনা কর ও তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা কর। তিনি সর্বদাই অতিলৌকিক স্তরে অবস্থান করেন এবং সকলের মনের কথা জানেন—তিনি অন্তর্যামিনী।"

স্বামী, শিষ্য-শিষ্যা-ভক্ত, সাধন-ভজন ইত্যাদি নিয়ে শ্রীমা'র দিন বেশ কাটছিল। কিন্তু তাতে ছেদ পড়ে ১৮৮৫ সালের মাঝামাঝি থেকে। এই সময় থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের গলায় ক্ষতরোগ দেখা দিল। কাশলেই রক্ত বার হত। কলকাতায় শ্যামপুকুরে আনা হল সুচিকিৎসার জন্য। শ্রীশ্রীমাকেও ঠাকুরের সেবার জন্য, তাঁর খাবার ইত্যাদি তৈরি করবার জন্য কলকাতায় আনা হল। পরে কাশীপুর উদ্যানবাটীতেও শ্রীমা এলেন ঠাকুরের সেবার জন্য। এখানে ঠাকুর তাঁর শেষ সময়ে শ্রীশ্রীমাকে 'অনেক কাজ করতে হবে' এই দায়িত্ব দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমা হিন্দু প্রথা অনুযায়ী নিজের শরীর থেকে এক-একটি করে গহনা খুলে ফেলতে শুরু করলেন। এমন সময় অনুভব করলেন, ঠাকুর তাঁর হাত চেপে ধরে বলছেন, "আমি কী মরে গেছি যে তুমি বিধবা সাজতে যাচ্ছ? আমি কেবল এ-ঘর থেকে ও-ঘরে গেছি।" এই নির্দেশ পাওয়ার পর তিনি আর হাতের বালা খুললেন না এবং যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন হাতে বালা পরেই ছিলেন।

এরপর শ্রীশ্রীমা কাশীপুরের উদ্যানবাটী ছেড়ে বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়িতে আসেন। মনের দুঃখ দূর করার জন্য তিনি তীর্থযাত্রায় বের হলেন। দেওঘর, কাশী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ, দক্ষিণ ভারত ইত্যাদি সমস্ত তীর্থক্ষেত্রে যান। এইসব জায়গায় থাকাকালীন তিনি অনেকবার ঠাকুরকে দর্শন করেন এবং তাঁর নির্দেশ লাভ করেন। ঠাকুরের নির্দেশমতো তিনি প্রথম দীক্ষা দেন যোগীনকে। পরে ইনিই নাম নেন স্বামী যোগানন্দ মহারাজ।

কলকাতার বাঁধাধরা জীবন থেকে কিছুদিনের জন্য রেহাই পাবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে জয়রামবাটীতে ও কামারপুকুরে এসে থাকতেন। জয়রামবাটীতে তিনি ভাইয়ের সংসার দেখাশুনা করতেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। তাদের সৎ জীব-যাপন করার উপদেশ দিতেন। একবার ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন—"তুমি কামারপুকুরে থাকবে; শাক বুনবে শাকভাত খাবে আর হরিনাম করবে। দেখ, কারও কাছে একটি পয়সার জন্য চিৎ হাত করো না। তোমার মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। একটি পয়সার জন্যে যদি কারও কাছে হাত পাত, তবে তার কাছে মাথাটি কেনা হয়ে থাকবে।"

গ্রামের সকলে যেমন তাঁকে দেখার জন্য, তাঁর কথা শোনার জন্য উৎসুক হয়ে থাকত তিনিও তেমনি তাদের সকলের খোঁজখবর করতেন। এ-ব্যাপারে তাঁর কাছে জাতপাতের কোনো বালাই ছিল না। আমজাদ নামে এক মুসলমান মায়ের নতুন বাড়ির দেওয়াল তৈরি করেছিল। তাকে মা একদিন নিজের বারান্দায় বসে খাইয়েছিলেন। মায়ের ভাইঝি নলিনী উঠোনে দাঁড়িয়ে দূর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমজাদের পাতায় খাবার দিচ্ছে দেখে মা নিজের হাতে সযত্নে খাবার দিতে লাগলেন। পরে সেই জায়গাটা পরিষ্কারও করেদিলেন। এ দেখে ভাইঝি চিৎকার করে বলে ওঠে, ও পিসি, তোমার যে জাত গেল। মা তাকে ধমক দিয়ে বলেন—"আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমনি ছেলে।"

শ্রীশ্রীমা ছিলেন একেবারে গাঁয়ের মেয়ে, তারপরেও তিনি ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ বংশের। লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিদেশি মহিলারা তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করতেন। তাঁদের তিনি আদর করতেন, নিজের মেয়ের মতন স্নেহ করতেন, তাঁদের অসুখ করলে উতলা হতেন। এইরকম কয়েকজনের নাম হল—মার্গারেট নোবেল (ভগিনী নিবেদিতা), মিস ম্যাকলাউড, মিসেস ওলি বুল প্রমুখ। নিবেদিতাকে মা 'আমার খুকী' বলে ডাকতেন। নিবেদিতা মাকে 'হোলি মাদার' বা 'মাতা দেবী' বলে ডাকতেন। নিবেদিতা যখন মা'র কাছে যেতেন তখন মাকে তিনি আপন মায়ের মতো আদর করতেন, আদর করে নিজের হাতে খাওয়াতেন। সেজন্যই নিবেদিতা মা-র সম্বন্ধে বলেন—'তিনি কি প্রাচীন আদর্শের শেষ কথা, না নতুন আদর্শের

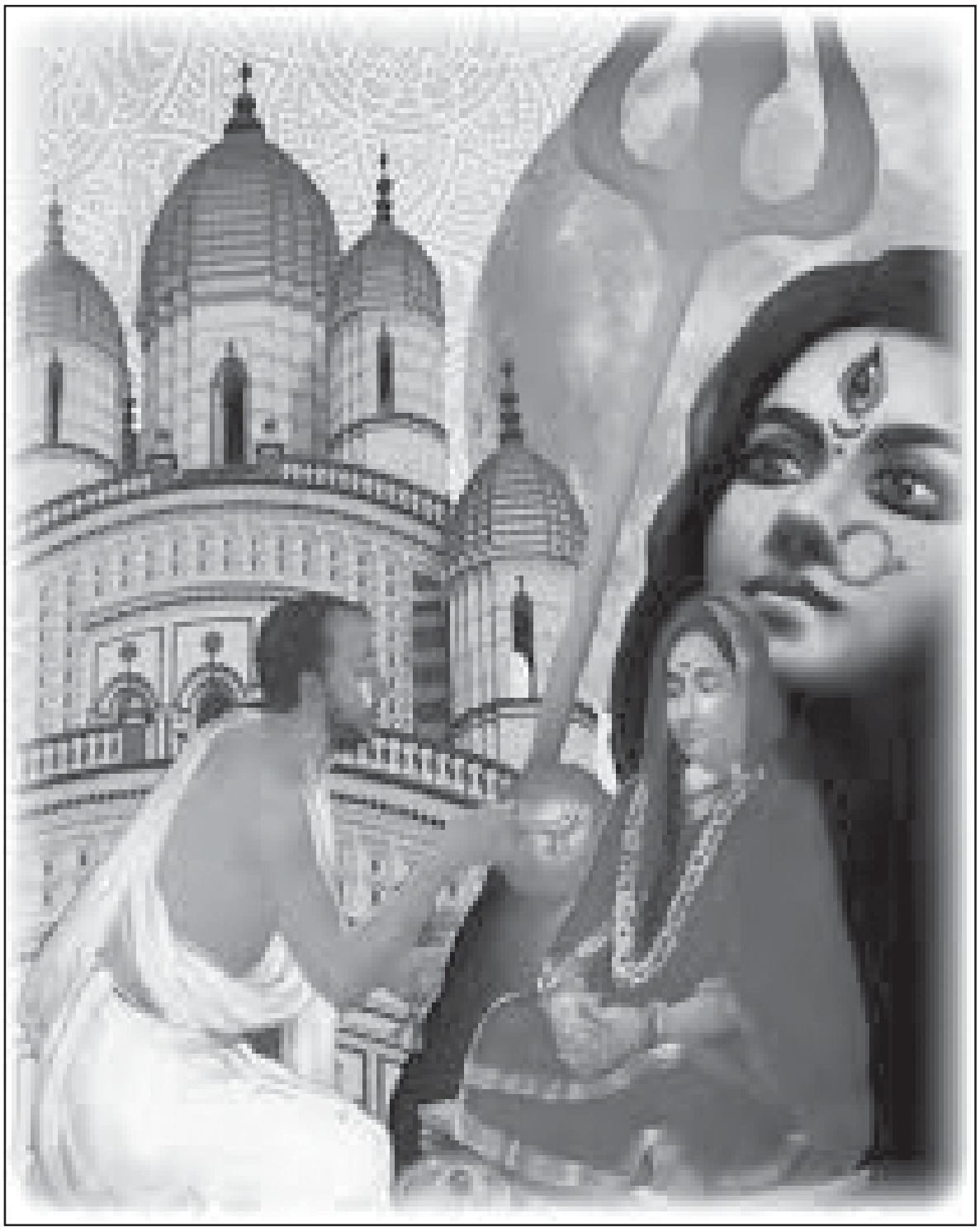

● ষোড়শীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃপূজা।

প্রথম প্রকাশ? আবার তাঁর উদার মুক্ত মনের মহিমার কথাও নিবেদিতা লিখেছেন। শ্রীশ্রীমা নিবেদিতাকে বিশেষ স্নেহ করতেন বলেই প্রায়ই ধ্যান করার সময় তাঁকে তাঁর পাশে বসতে বলতেন। নিবেদিতা এই সময়টিকে 'শান্তির সময়' বলতেন।

১৮৯৮ সালের ১২ই নভেম্বর নিবেদিতা-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্বোধনের সময় শ্রীমা উপস্থিত থেকে বিদ্যালয়টি উদ্বোধন করে বলেন, "জগন্মাতা যেন এই বিদ্যালয়কে আশীর্বাদ করেন। এখান হতে শিক্ষিতা বালিকারা যেন সমাজের আদর্শস্থানীয়া হয়।" এই বিদ্যালয়টির বর্তমান নাম—সিস্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়।

শ্রীশ্রীমা'র স্বাস্থ্য কোনোদিনই খুব একটা ভালো ছিল না। মাঝে মাঝে অসুখ লেগেই থাকত। ১৯২০ সালের ২১শে জুলাই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগের আগের দু'বছর তিনি ম্যালেরিয়ায় খুব ভোগেন। এর ফলে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে। অস্থিচর্মসার অবস্থা। কলকাতায় এনে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে ম্যালেরিয়া নয়, তাঁর আসল রোগ কালাজ্বর। লীলা সংবরণের আগে মা তাঁর ভক্ত ও শিষ্য-শিষ্যাদের উদ্দেশে একটি উপদেশ দিয়ে যান। সেই উপদেশ ছিল "যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।" এটাই মায়ের শেষ বাণী।

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, "মা ঠাকরুণ কী বস্তু তোমরা কেউ বুঝতে পারোনি। মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষগুণ বেশি। ওই মায়ের সম্পর্কে আমিও একটু গোঁড়া। মা'র হুকুম হলেই বীরভদ্র ভূতপ্রেত সব করতে পারে। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গা-মাকে যেদিন বসিয়ে দেবে, সেই দিন একেবারে আমি হাঁফ ছাড়ব।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে পূজাদি করতেন। তিনি বলেন—"মাকে বুঝা ভারি শক্ত। ... তিনি হচ্ছেন জগজ্জননী। তিনি যে সত্যিকারের কী বস্তু তা যদি ঠাকুর আমাদের না স্বয়ং চিনিয়ে দিতেন, তাহলে আমরা কি তাঁকে চিনতে পারতাম।" ভক্তভৈরব গিরিশ ঘোষ একবার শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেন—"তুমি কিরকম মা?" মা উত্তরে বলেন, "আমি সত্যিকারের মা—কেবল গুরুপত্নী নয়, পাতানো-মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্যিকারের মা।"

১৮৯০ সালে ১৪ই ফেব্রুয়ারি গাজিপুর থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের গৃহী ভক্ত বলরাম বসুকে চিঠিতে লিখেছেন—"আমি কোন নরাধম, তাঁহার (শ্রীমা) সম্বন্ধে কোন বিষয়ে কথা কহি।" সারদাদেবী এক বিস্ময়কর চরিত্র। তিনি দেবী, মাতা, জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—একাধারে জননী ও দেবী। "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"—জগজ্জননী দেবীই আমাদের মধ্যে মানবী হয়ে শ্রীশ্রীমা সারদারূপে আবির্ভূতা। তাই তো তিনি বলেছিলেন—"আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।" শ্রীমা যে দেবী একথা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বলে গেছেন, স্বামী বিবেকানন্দও তাঁকে নিজের জন্মদাত্রী মায়ের চেয়েও বেশি ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। শিকাগো মহাধর্ম সম্মেলনে যাওয়ার আগে তিনি শ্রীমা-র অনুমতি নিয়েছিলেন। 'স্বামীজি শ্রীমাকে দেখতেন সংঘজননী' রূপে।

স্বামীজির পরিকল্পনায় ও শ্রীমা সারদার আশীর্বাদে স্ত্রীশিক্ষার জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হল ভগিনী নিবেদিতার পরিচালনায়। বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা, পীড়িতদের জন্য চিকিৎসা, আর্তত্রাণ, অনাথ বালক-বালিকাদের মানুষ করা, চরিত্র গঠনের জন্য সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেওয়া সবই চলতে থাকল।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবগ্রহণ করে, তাঁকে স্বীকার করে প্রায় ৩০/৩৫ বছর ধরে শ্রীমা রামকৃষ্ণ-ভাবধারার প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন; তাঁরই অনুপ্রেরণায় আজ রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সারা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি।

> জপতপের দ্বারা কর্মপাশ কেটে যায়, কিন্তু ভগবানকে প্রেমভক্তি ছাড়া পাওয়া যায় না। বৃন্দাবনে রাখালরা কি কৃষ্ণকে জপধ্যান করে পেয়েছিল? না, তারা 'আয়রে খারে নেরে'—এই করে পেয়েছিল।
>
> **—মা সারদাদেবী**

মূর্ত মহেশ্বর বিবেকানন্দ

এসো, মানুষ হও

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

"হে প্রভু, আমার ভ্রাতৃগণের ভয়ঙ্কর যাতনা আমি দেখেছি, যন্ত্রণামুক্তির পথ আমি খুঁজেছি এবং পেয়েছি—প্রতিকারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, প্রভু!" স্বামীজি বস্টন থেকে মে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক জে. এইচ. রাইটকে কথাগুলি লিখেছিলেন। স্বামীজি বলছেন : "আমি দেখেছি।" এই দেখার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে স্বামীজির জীবনদর্শন, ধর্ম ও কর্মকাণ্ড। তিনি ছিলেন এক অর্থে সমাজবিজ্ঞানী। গোটা ভারতটা ঘুরে দেখে নিলেন সবার আগে। এই আমার কর্মভূমি। কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম! সংগ্রাম নিরক্ষরতা, কুসংস্কার, দারিদ্র্য, বর্ণবৈষম্য, নারীশক্তির অবমাননার বিরুদ্ধে। সংগ্রাম ভারতবাসীর উদাসীনতার বিরুদ্ধে। যাদের আছে, যারা কিছু করতে পারে অথচ করে না, তাদের নিরেট স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে।

খেতড়ির পণ্ডিত শঙ্করলালকে পরিব্রাজক স্বামীজি বোম্বাই থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯২ তারিখে লিখছেন : "আমাদিগকে ভ্রমণ করিতেই হইবে, আমাদিগকে বিদেশে যাইতেই হইবে। আমাদিগকে দেখিতেই হইবে, অন্যান্য দেশে সমাজ-যন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে। আর যদি আমাদিগকে যথার্থই পুনরায় একটি জাতিরূপে গঠিত হইতে হয়, তবে অপর জাতির চিন্তার সহিত আমাদের অবাধ সংস্রব রাখিতে হইবে। সর্বোপরি আমাদিগকে দরিদ্রের উপর অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে।"

স্বামীজির কী ভয়ঙ্কর দর্শন-ক্ষমতা, অবজারভেশন, কস্টিক রিমার্ক! একজন ভাঙ্গির জীবন সম্পর্কে ঐ-চিঠিতে স্বামীজি লিখছেন, সমাজের হিংস্রতম অশ্রদ্ধার বোঝা বইছে। সর্বত্রই চিৎকার—'তফাত যাও'! যেন সংগ্রামক ব্যাধি। 'ছুঁস না, ছুঁস না!' এইবার যদি কোনো পাদ্রী সাহেব তার মাথায় জল ছিটিয়ে মন্ত্র পড়ে খ্রিস্টান করে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সে জাতে উঠে গেল। গোঁড়া বর্ণহিন্দুরাও তাকে আদর করে বসার চেয়ার এগিয়ে দেবে। করবে সপ্রেম করমর্দন।

এই হল তখনকার ভারত! এই হল তখনকার উচ্চবর্ণের মানসিকতা! দক্ষিণ ভারতে আরেক খেলা। সেখানে স্বামীজি দেখলেন, লক্ষ লক্ষ ব্রাত্য মানুষকে খ্রিস্টান করা হচ্ছে। উচ্চবর্ণের অনাদরই এর জন্য দায়ী। গভীর বেদনা ও ক্ষোভের সঙ্গে স্বামীজি পণ্ডিত শঙ্করলালকে লিখলেন : "পৌরোহিত্যের অত্যাচার ভারতের সর্বাপেক্ষা যেখানে বেশি, সেই ত্রিবাঙ্কুরে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ সমুদয় ভূমির স্বামী এবং স্ত্রীলোকেরা—এমনকি রাজবংশীয় মহিলাগণ পর্যন্ত—ব্রাহ্মণগণের উপপত্নীরূপে বাস করা খুব সম্মানের বিষয় জ্ঞান করিয়া থাকে, তথাকার সিকিভাগ খ্রিস্টান হইয়া গিয়াছে।"

এই ভারতচিত্রে ক্ষুব্ধ স্বামীজি হিন্দুধর্মের মর্মোদ্ধারে আগ্রহী। ধর্মের গভীরে কি কোনো সত্যই নেই? স্বামীজি বললেন, হিন্দুধর্মের মতো কোনো ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, অথচ আচরণে সেই ধর্ম কি পৈশাচিক! গরিব আর পতিতের গলায় পা তুলে দেয়। জগতের আর কোনো ধর্ম তো এমন করে না। তাহলে হিন্দুধর্মের গর্বের আর রইল কি। না, এতে ধর্মের কোনো দোষ নেই। ধর্ম ঠিকই আছে, আকাশের মতো উদার। আমেরিকা থেকে ২০ আগস্ট ১৮৯৩ তারিখে আলাসিঙ্গাকে স্বামীজি লিখছেন : "তবে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড 'পারমার্থিক' ও 'ব্যবহারিক' নামক মত দ্বারা সর্বপ্রকার অত্যাচারের আসুরিক যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে।"

লেখক—বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও গ্রন্থকার।

● ধ্যানমগ্ন বিবেকানন্দ।

স্বামীজির সংগ্রাম ছিল একক সংগ্রাম। একাই লড়াই করে গেছেন যত বিরূপ শক্তির সঙ্গে। বিশ্বগোলকটিকে দুহাতে ধরে এমন নাড়া দিয়ে গেছেন, যে-আন্দোলন আজও স্থির হয়নি। অন্ধকারের শক্তি, বিষাক্ত শৈবাল কিছু ঝরে গেলেও, ক্লেদ এখনো আছে। ধর্ম সমদর্শী হলেও ধর্মের ধারকরা কেউই আদর্শ নয়। স্বামীজিকেও যারা জোচ্চোর, বদমাইশ বলেছে, উপহাস করেছে, ঘৃণা করেছে তাদের সম্পর্কে স্বামীজির একটিই কথা : "আমি এ সমস্তই সহ্য করিয়াছি তাহাদেরই জন্য, যাহারা আমাকে উপহাস ও ঘৃণা করিয়াছে।" বলছেন, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। তোমাদের আঘাত যত প্রবল হবে, আমার শক্তি তত দুর্বার হবে। এই মানুষই একদা পরিত্রাতা যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। দিস ইজ দ্য ফেট অফ ম্যানকাইন্ড। বৎস! এ-জগৎ

দুঃখের আগার। অবশ্যই। কিন্তু এ যে আবার মহাপুরুষগণের শিক্ষালয়স্বরূপ। মানুষের আঘাতেই কোনো কোনো মানুষের শক্তির উৎস-মুখ বিদীর্ণ হয়। অর্জুন ভূমিতে একটি তীর নিক্ষেপ করলেন অমনি শতধারায় জল উৎক্ষিপ্ত হয়ে পিতামহ ভীষ্মের তৃষ্ণা তৃপ্ত করল। তোমরা পেটাও আমি তরোয়াল হই। তোমরা বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে যাও, আমার স্টিল টেম্পার্ড হোক। যারা আমাকে ভণ্ড বলছে, তাদের জন্যে আমার দুঃখ হয়। তাদের কোনো দোষ নেই। তারা শিশু, অতি শিশু, যদিও সমাজে তারা মহা গণ্যমান্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত। নিজেদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিসীমার বাইরে তারা আর কিছু দেখতে পায় না। তাদের নিয়মিত কাজ হল আহার, পান, অর্থোপার্জন আর বংশবৃদ্ধি। অঙ্কের নিয়মে পরপর করে চলেছে। এর অতিরিক্ত তাদের মাথায় আসে না। তারা যথেষ্ট সুখী। তাদের ঘুমের ব্যাঘাত কিছুতেই হয় না। স্বামীজি যেন তাঁর রক্ত দিয়ে লিখলেন কথাগুলি : "শত শত শতাব্দীর পাশব অত্যাচারের ফলে সমুত্থিত শোক, তাপ, দৈন্য ও পাপের যে কাতরধ্বনিতে ভারতাকাশ সমাকুল হইয়াছে, তাহাতেও তাহাদের জীবন সম্বন্ধে দিবাস্বপ্নের ব্যাঘাত হয় না। সেই শত শত যুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারের কথা যাহাতে ভগবানের প্রতিমাস্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দভে এবং ভগবতীর প্রতিমারূপা নারীকে সন্তান ধারণ করিবার দাসীস্বরূপা করিয়া ফেলিয়াছে এবং জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে, এ কথা তাহাদের স্বপ্নেও মনে উদিত হয় না!" আমার ভারত এই ভোগী, স্বার্থপর, পরদ্বেষী, আত্মপর, পরনিন্দুক ব্যবহারিকদের নিয়ে নয়। আছে, মানুষ আছে। তাঁরা প্রাণে প্রাণে বুঝছেন, হৃদয়ের রক্তময় অশ্রুবিসর্জন করছেন। তাঁরা মনে করেন, এর প্রতিকার আছে। শুধু প্রতিকার আছে নয়, প্রাণ পর্যন্ত পণ করে এর প্রতিকারে প্রস্তুত আছেন। স্বামীজি বললেন : "ইহাদিগকে লইয়াই স্বর্গরাজ্য বিরচিত। ইহা কি স্বাভাবিক নহে যে, উচ্চস্তরে অবস্থিত এইসকল মহাপুরুষের—ঐ বিষোদ্গারণকারী ঘৃণ্য কীটগণের প্রলাপবাক্য শুনিবার মোটেই অবকাশ নাই?"

স্বামীজির কোনকালেই এদের ওপর ভরসা ছিল না। ঐ যারা গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনী, জীবনীশক্তিহীন একদল স্বার্থপর—তারা মৃতকল্প। নিজেদের জগতে তারা ভোগের বেহালা বাজাচ্ছে। ভরসা তাহলে কাদের ওপর? দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আলাসিঙ্গাকে তিনি লিখলেন : "ভরসা তোমাদের উপর—পদমর্যাদাহীন, দরিদ্র, কিন্তু বিশ্বাসী—তোমাদের উপর।" ওদের ভারত নয়, তোমাদের ভারত। সংগ্রামের একটিই হাতিয়ার! বিশ্বাস বললেন : "ভগবানে বিশ্বাস রাখ। কোনো চালাকির প্রয়োজন নাই; চালাকির দ্বারা কিছুই হয় না।"

অনুভব কর। "দুঃখীদের ব্যথা অনুভব কর।" আর সাহায্য চাও ভগবানের কাছে। সাহায্য আসবেই আসবে! বারোটা বছর আমি এই ভার নিয়ে, ধনীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি। বেরিয়ে এস ভোগের লেপের তলা থেকে। ভারত গড়। তারা আমাকে জোচ্চোর ভেবেছে। এই গরিব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িত ভারতের দায় আমি তোমাদের সমর্পণ করছি। জাগো, যুবশক্তি জাগো। অপূর্ব ভাষায় স্বামীজি বলছেন : "যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে—যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ-অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও, এবং তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর; বলি—জীবনবলি তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীনদরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সারা জীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।"

অধ্যাপক রাইটকে ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ সালে স্বামীজি লিখছেন :

"পাহাড়ে, পর্বতে উপত্যকায়,
গির্জায়, মন্দিরে, মসজিদে—
বেদ বাইবেল আর কোরানে
তোমাকে খুঁজেছি আমি ব্যর্থ ক্রন্দনে।
মহারণ্যে পথভ্রান্ত বালকের মতো
কেঁদে কেঁদে ফিরেছি নিঃসঙ্গ,
তুমি কোথায়—কোথায়
আমার প্রাণ, ওগো ভগবান?
নাই, প্রতিধ্বনি শুধু বলে, নাই।
দিন, রাত্রি, মাস, বর্ষ কেটে যায়,
আগুন জ্বলতে থাকে শিরে,
কিভাবে দিন রাত্রি হয় জানি না,
হৃদয় ভেঙে যায় দুভাগ হয়ে।
গঙ্গার তীরে লুটিয়ে পড়ি বেদনায়,

রোদে পুড়ি, বৃষ্টি ভিজি,
ধূলিকে সিক্ত করে তপ্ত অশ্রু,
হাহাকার মিশে যায় জনকলরবে;
সকল দেশের সকল মতের মহাজনদের
নাম নিয়ে ডেকে উঠি অধীর হয়ে,
বলি, আমাকে পথ দেখাও, দয়া কর,
ওগো, তোমরা যারা পৌঁছেছ পথের প্রান্তে।"

এই মহা অন্বেষণের উত্তর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিনের ঘটনা। ঠাকুর বসে আছেন ভক্তসঙ্গে। আছেন নরেন্দ্রনাথ। ঠাকুর বলছেন, ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জ্ঞান করে সর্বদা সাধু-ভক্তদের শ্রদ্ধা, পূজা আর বন্দনা করবে, আর কৃষ্ণেরই জগৎ-সংসার একথা হৃদয়ে ধারণ করে সর্বজীবে দয়া করবে। 'সর্বজীবে দয়া' পর্যন্ত বলে ঠাকুর সমাধিস্থ। কিছুক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশায় বললেন : "জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা; কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!"

ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পর নরেন্দ্রনাথ ঘরের বাইরে এসে বললেন, কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখতে পেলুম! শুষ্ক, কঠোর, নির্মম বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সঙ্গে মিলিয়ে কি সহজ, সরল ও মধুর আলোকই প্রদর্শন করলেন! সর্বভূতে যতদিন না ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়া যায়, ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তি লাভ সাধকের পক্ষে সুদূরপরাহত। ভগবান যদি কখনো দিন দেন তো আজ যা শুনলুম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করব—পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল—সকলকে শুনিয়ে মোহিত করব।

পর্যটক স্বামী বিবেকানন্দ যত দেখছেন ততই জ্বলে উঠছেন, যেন এক অগ্নিগোলক। আমেরিকার পথে জাপানের ইয়োকোহামা থেকে ১০ জুলাই ১৮৯৩ লিখছেন নিজের শিক্ষিত দেশবাসীকে তিরস্কার করে : "তোমরা কি করছ? সারাজীবন কেবল বাজে বকছ। এস, এদের দেখে যাও, তারপর যাও—গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে! তোমরা—দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাত যায়!! এই হাজার বছরের ক্রমবর্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ? হাজার বছর ধরে খাদ্যখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধতা বিচার করে শক্তিক্ষয় করছ। পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ! শত শত যুগের অবিরাম সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে! ... তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পায়চারি করছ! ইউরোপীয় মস্তিষ্কপ্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণামাত্র—তাও খাঁটি জিনিস নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছ, আর তোমাদের প্রাণমন সেই ৩০ টাকার কেরানিগিরির দিকে পড়ে রয়েছে; নাহয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকিল হবার মতলব করছ। এই হল ভারতীয় যুবকগণের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা। প্রত্যেকের আশেপাশে একপাল ছেলে—তাঁর বংশধরগণ—'বাবা খাবার দাও, খাবার দাও' বলে মহা চিৎকার তুলেছে!! বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে, তোমাদের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সমেত তোমাদের ডুবিয়ে ফেলতে পারে না?"

স্বামীজির উদাত্ত আহ্বান—"এসো, মানুষ হও। প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও। কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখনো শুধরোবে না। তাদের হৃদয়ের কখনো প্রসার হবে না।" বলছেন, নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এস। পৃথিবীর দিকে তাকাও—সি দ্যঁ প্রগেস। দেশকে যদি ভালবাস তাহলে উন্নত হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর। বলছেন : "পেছনে চেও না, অতি প্রিয় আত্মীস্বজন কাঁদুক; পেছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্তত সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়। রাখো তোমাদের ঘণ্টা নাড়া। রাখো তোমাদের সেই ছেঁড়াছেঁড়ি তর্ক, শ্রীরামকৃষ্ণ মানব না অবতার! আমার প্রভু গুরু হতে চাননি, তাঁর গেরুয়ার বাণী—সেবা। তাঁর শেষ কথা—'তোমাদের চৈতন্য হোক।' মহা হুঙ্কারে ভারত গঠনের কাজ আরম্ভ করে দাও। ভয় কি? কার সাধ্য বাধা দেয়।"

স্বামীজি লিখছেন গুরুভাইদের (নিউইয়র্ক ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪) :

"কুর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ।
কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্—রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্।"

"ডর? কার ডর? কাদের ডর?

"আমরা তারকা চর্বণ করব, ত্রিভুবন সবলে উৎপাটন করব, আমরা কে জান না? আমরা রামকৃষ্ণ-দাস!"

দেহকে যারা আত্মা বলে জানে তারা ক্ষীণ, দীন, তারাই নাস্তিক। আমরা যখন অভয়পদে আশ্রিত, তখন আমরা ভয়শূন্য বীর। এইটাই আস্তিক্য। "রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্!"

বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ

শ্যামলকুমার সেন

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজি আন্তর্জাতিক জগতের এক অবিস্মরণীয় নাম। জগৎগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামীজি সম্বন্ধে বলেছিলেন, নরেন শিক্ষা দেবে, সে আমার শ্বশুর ঘর, রাঙা চক্ষু রুই মাছ, জালার মধ্যে বড় জালা, দীঘির মধ্যে সায়র দীঘি। রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে যখন স্বামীজিকে কিছু বলতে বলা হত তিনি বলতেন, "আমাকে দিয়ে রামকৃষ্ণদেবকে বিচার করতে যেও না, আমি একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র মাত্র, তাঁহার চরিত্র এতই মহান আমি অথবা তাঁহার কোনো দীক্ষিত সন্তান যদি শত শত জনম পরিগ্রহ করি তবুও তাঁহার লক্ষ লক্ষ অংশের এক অংশও বর্ণনা করতে পারব না।" আবার মা সারদা সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্বামীজি বলতেন, "রামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদের চেয়ে সারদা মায়ের কৃপা লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি। মায়ের আশীর্বাদ আমার নিকট জীবনপথের পাথেয়। ভাই দয়া করে আমাকে ক্ষমা কর। আমি মায়ের ব্যাপারে বড়ই গোঁড়া। মা যদি কৃপা করেন তাঁর এই ব্রহ্মদৈত্য যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। তাই আমেরিকা যাবার আগে মায়ের আশীর্বাদের জন্য চিঠি লিখি। তাঁহার আশীর্বাদে আমি এক লাফে সাগর ডিঙিয়ে চলে গেলাম। কোনো মহৎ কাজ পরিশ্রম ব্যতিরেকে সমাধা হয় না।" স্বামীজি আরো বলতেন, "কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা জগতের বড় বড় কাজ সমাধা হয়েছে।" বিবেকানন্দজি ছোটবেলা থেকে খুবই সংগ্রামী ছিলেন। স্বামীজির স্কুলের ভূগোলের শিক্ষকমশাই বেত দিয়ে তাঁকে প্রহার করেছিলেন যদিও স্বামীজি উত্তরটা সঠিক দিয়েছিলেন। অথচ মাস্টারমশাই তাঁর উত্তরটা বুঝে উঠতে পারেননি। যার ফলে স্বামীজি তাঁর মাকে বলেছিলেন, "আমি কাল থেকে স্কুলে যাব না। আমি মাস্টারমহাশয়ের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছিলাম কিন্তু মাস্টারমশাই আমাকে খুবই মেরেছিলেন।" তাঁরই উত্তরে মা বলেছিলেন, "তুমি তো সঠিক উত্তর দিয়ে সত্যের জন্য মার খেয়েছ। ভুলের জন্য মার খাওনি। তুমি কাল থেকে স্কুলে যাও।" তখন স্বামীজি বলেছিলেন, "সত্যের জন্য সব কিছু ছাড়া যায়, কিন্তু সব কিছুর জন্য সত্যকে ছাড়া যায় না।" তাঁর গুরু রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, "সত্য কথা কলির তপস্যা, যে সত্য ধরে আছে সে মায়ের কোলে শুয়ে আছে।" তাই ঠাকুর, মা সারদা ও স্বামীজি তিনে এক একে তিন। খুব নীরবতার মধ্যে একবার স্বামীজি বলরামবাবুর বাড়িতে বেদপাঠ করছিলেন হঠাৎ গিরিশ ঘোষ প্রশ্ন করলেন, "নরেন! তোমার বেদে এইসব কিছু আছে কি যে বাড়িতে আগে পঞ্চাশখানা পাতা পড়তো সে বাড়িতে এখন হাঁড়ি চড়ে না, দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের কষ্ট, প্লেগে অনেক মানুষ মরে যাচ্ছে।" সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজি হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বেদপাঠ বন্ধ করে চলে গেলেন। সামনে বসেছিলেন স্বামীজির শিষ্য শরৎ চক্রবর্তী মহাশয়। তাঁকে সম্বোধন করে গিরিশ ঘোষ বলেছিলেন, "হে বাঙ্গাল তোর স্বামীজিকে বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে ভালবাসি নারে, দেখলি গরিবের কথা বলতেই কোথায় বেদ-বেদান্ত উড়ে গেল।" কারণ এসব কথা স্বামীজি নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন। বাবা বিশ্বনাথ দত্ত হঠাৎ মারা গেলেন। তখন তাঁর বাড়িতে কোনো টাকা-পয়সা ছিল না। পুরো সংসারটা কালো মেঘের মতো ঢেকে গেল। তাঁর বাড়িতেও ৫০ জন প্রত্যহ আহার গ্রহণ করত। একদিন স্বামীজি দেখলেন বাড়িতে দু' ভাই ও মায়ের চাল হবে না, মা ভুবনেশ্বরী দেবীকে তিনি বললেন, মা আমার জন্য চাল নিও না। আমার বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ আছে। তার উত্তরে মা বলেছিলেন, "তোর কোন বন্ধু আছে রে? সব বন্ধুই তো তোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলে গেছে। প্রত্যেক দিন

লেখক—প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, মান্যবর প্রাক্তন রাজ্যপাল ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক।

● যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ।

তোকে কোর্টে যেতে হয়। বাড়িটা নিলামে চড়িয়েছে।" সারা দিনরাত তিনি কর্পোরেশনের জল খেয়েই কাটিয়ে ছিলেন। এইভাবে স্বামীজির জীবন দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল। এত দুঃখেই তাঁর মুখ থেকে ধ্বনিত হয়েছিল—"যত উচ্চ তোমার হৃদয় তত দুঃখ জানিও নিশ্চয় হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক এ জগতে নাহি তব স্থান, হও জড়প্রায় অতি নীচ মুখে মধু অন্তরে গরল স্বার্থপরায়ণ তবে পাবে এ জগতে স্থান।" স্বামীজি বিদেশে যে সব ডায়াসে ভাষণ দিতেন কলকাতার লোক গিয়ে স্বামীজির বিরুদ্ধে ভাষণ দিতেন। স্বামীজি তাঁর গুরুভাইদের লিখেছিলেন তোরা একটা রেজুলেশন করে পাঠা যে আমি তোদের প্রতিনিধি, এরা তো আমাকে কোনো কাজ করতে দিচ্ছে না। এইসব দুঃখ নিয়েই স্বামীজিকে সারা জীবন চলতে হয়েছে। বেলুড় মঠে স্বামীজি যে ঘরে থাকতেন, একদিন সেখানে গভীর রাতে কাঁদতে কাঁদতে গড়াগড়ি দিয়ে এপাশ-ওপাশ করছিলেন। পাশের ঘরে থাকতেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, উনি কান্নার আওয়াজ শুনে পাশের ঘরে এসে স্বামীজিকে জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করলেন, স্বামীজি কি অসুস্থ! এরকম করে কাঁদছেন কেন? স্বামীজি বিজ্ঞানানন্দকে পেশন বলে ডাকতেন। পেশন তোরা এখনো ঘুমাসনি? আমি ভারতবর্ষের গরিব মানুষগুলো যাতে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় তার জন্য ঠাকুরের (রামকৃষ্ণদেব) কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করছিলাম। এইরকম হৃদয় নিয়ে স্বামীজি জগতে এসেছিলেন। উনি বলতেন—"He who sees shiv in the poor, in the diseased, in the miserable, he really worships Shiva." সেই প্রকৃত শিব পূজা করে যে শিবকে দেখে আর্তের মধ্যে, পীড়িতের মধ্যে, গরিবের মধ্যে। তিনি কাশীধামে আছেন একজনের বাড়িতে অতিথি হয়ে। একদিন পথের মধ্যে একজন কলেরা রুগীকে দেখে ওনার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। এই রুগীকে বাঁচাতে হবে, আবার ভাবলেন তিনি পরের বাড়িতে অতিথি হয়ে আছেন। এইরূপ চিন্তা করতে করতেই তিনি তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে গেলেন এবং সেবা-শুশ্রূষা করে তাকে আবার বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, The poor, the misers are for your salvation. অর্থাৎ ভিখারি যদি না থাকত গরিব যদি না থাকত তুমি ভিক্ষাটা কোথায় দিতে। ওরা ওই জায়গায় বসে তোমার থেকে ভিক্ষা নিয়ে তোমাকেই ধন্য করছে। দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠাতা অন্নদাঠাকুর প্রথমেই তৈরি করলেন স্বামী-পুত্রহীনা বিধবা মায়েদের জন্য মাতৃ আশ্রম। স্বামীজি বলতেন, I do not believe in a God who will not wipe out a widow's tears or to bring a piece of bread to the orphan mouths. অর্থাৎ আমি সেই ধর্ম বিশ্বাস করি না, যে ধর্ম বিধবা মায়ের চোখের জল মোছাতে পারে না। অথবা অনাথ ছেলেমেয়েদের মুখে রুটি দিতে পারে না। অন্নদাঠাকুর তারপর করলেন মেয়েদের জন্য বালিকাশ্রম। বিবেকানন্দ বলতেন, "ছেলেদের এবং মেয়েদের একই সত্তা থাকবে। মেয়েরা যদি সমাজে তাদের শক্তি দিতে না পারে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শুধু আমার পিতৃদেবকে দিয়ে সমাজ বাঁচতে পারে না। আমার পরিবারে আমার মা ঠিক তো সব ঠিক। আমাকে অনেকে প্রশ্ন করে মেয়েদের সম্বন্ধে আমার কি ধারণা? আমি কি মেয়েছেলে? তোমরা আমায় এই প্রশ্ন করছো? তুমি কে যে মেয়েদের সমস্যা সমাধান করবে? তুমি কি ভগবান? সমস্ত বিধবা মা এবং মেয়েদের উপর খবরদারীপনা করবে? হাত গুটাও। মেয়েদের সমস্যা মেয়েদের মিটাতে দাও।" স্বামীজি বাগবাজারে যাবেন সারদা মাকে দর্শন করতে। সকালবেলায় গঙ্গায় ডুব দিচ্ছে তো ডুব দিচ্ছে। গুরুভাই এরা বলছেন ভাই ঠাণ্ডা লেগে যাবে। উত্তরে স্বামীজি বলছেন, "মাকে দর্শন করতে যাব তো তাই পবিত্র হয়ে নিচ্ছি।" তারপর নৌকায় উঠলেন, বেলুড় মঠ থেকে বাগবাজার পর্যন্ত শুধু গঙ্গার ঘোলা জলই খাচ্ছেন।

বেলুড় মঠ তখন গড়ার পথে। অদ্বৈতানন্দ মহারাজ (বুড়ো গোপাল) তখন মঠের কাজকর্ম দেখাশুনা করেন। ওই শ্রমিকরা যখন কাজে আসতেন স্বামীজি তাদের পরিবারের সুখ-দুঃখের খবরাখবর নিতেন। শ্রমিকরা স্বয়ং এই শিবকে পেয়ে কাজকর্ম সব ভুলে যেতেন। বুড়ো গোপাল এসে কেন কাজ কম হল তার জন্য শ্রমিকদের বকাবকি করতেন। স্বামীজি যখন আবার আসলেন শ্রমিকরা বলল, "স্বামী বাবা তুই আমাদের কাছে আর আসিস না, তুই এলে কাজ কম হয়, বুড়ো বাবা আমাদের বকাবকি করে।" উত্তরে স্বামীজি বললেন, "আমি বুড়ো বাবাকে বলে দেব যেন বুড়ো বাবা তোদের আর বকাবকি না করেন।" স্বামীজি এইসব শ্রমিকদের মধ্যে নারায়ণ দর্শন করতেন। স্বামীজি নিজেও বলেছিলেন, "After so much austerity, I have understood this is the real truth that God is present in every Jivo (Human being). There is no other God besides these. Who serves Jiva, serves God indeed." অর্থাৎ এত তপস্যার পর এই বুঝলাম ভগবান প্রত্যেক জীবে জীবে অধিষ্ঠান করে আছেন, এছাড়া

ভগবান-টগবান আমি বুঝি না। জীবসেবা মানেই ভগবানের সেবা।

সমস্ত ধর্মের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা জানাতেন। স্বামীজি বলেছিলেন, I shall go to the Mosque of the Mahamedam, I shall enter into the Khristan Church and kneel before the crucifix, I shall go to the Buddhistic temple where I shall take refuse in Buddha and his law, I shall enter into the forest and sit down in meditation with the Hindu. Not only shall I do all these but I shall keep my heart open for all. That may come in the future." অর্থাৎ আমি মুসলিমদের মসজিদে যাব, খ্রিস্টানদেব গির্জায় যাব এবং নতজানু হয়ে তাঁর পবিত্র ক্রুশের সামনে প্রণাম জানাবো। আমি বুদ্ধের মন্দিরে যাব এবং তাঁর ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হব। এছাড়া হিন্দুদের সঙ্গে গভীর অরণ্যের মধ্যে ধ্যানে নিমগ্ন থাকব। এইসব করব তাই নয়, আমার হৃদয়বার্তা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, সকলে এসে যেন আমার কাছে জুড়াতে পারবে। ওনার এই আদর্শ মেনে দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠাতা অন্নদাঠাকুর যে মন্দির করেছিলেন, তার চূড়ায় বসিয়েছিলেন, হিন্দুধর্মের ত্রিশূল, খ্রিস্টান ধর্মের ক্রুশ, মুসলিম ধর্মের চাঁদ-তারা এবং বৌদ্ধধর্মের পাখা। তুরিয়ানন্দকে (হরি ভাই) স্বামীজি বলেছিলেন, "হরি ভাই ভগবান লাভটাভ কিছু বুঝি না, তবে হৃদয়টা বড় হয়েছে, গরিবের জন্য চিন্তা, দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য আমার ক্রন্দন, প্লেগে হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে", তাদের রক্ষার জন্য মঠের গুরুভাইদের বলেছিলেন, "আমরা রাস্তার সাধু, মঠ বিক্রি করে দে। মঠ বিক্রি করে প্লেগের সেবা কর।" সারদা মা বকলেন, তাই আর মঠ বিক্রি করা হল না।

১৮৯৩, ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্মসভায় সারা পৃথিবী থেকে সাড়ে ছয় হাজার প্রতিনিধির মধ্যে তিনি বললেন— "Oh, My dear sisters and brothers of America. I am proud to belong to a religion which has thought the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, we accept all the religion as true." অর্থাৎ "ও আমার আমেরিকার প্রিয় ভগিনীগণ এবং ভ্রাতাগণ, আমি এই হিন্দুধর্মে জন্মগ্রহণ করেছি বলে নিজেকে গর্ব বোধ করি, যে ধর্ম সব ধর্মকে নিয়েছে এবং সব ধর্মকে গ্রহণ করেছে আমরা শুধু সহ্য করি না সব ধর্ম সত্য বলে গ্রহণ করি।"

স্বামীজি যখন দেখলেন শিকাগো মহাধর্ম সম্মেলনে যার যার ধর্মকে বড় করার ধান্দা করছে, তাই ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ শেষের দিনে বলেছিলেন—"অর্থাৎ এই ধর্ম মহা সম্মেলন যদি জগৎকে কিছু দিয়ে থাকে এটি এই দয়া, দাক্ষিণ্য, সাধুচরিত্র এবং পবিত্রতা কোনো একটা ধর্মের নিজস্ব সম্পদ নয়, প্রত্যেক ধর্মই উন্নত চরিত্রের নরনারী প্রসব করেছেন। এত কিছু হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি মনে করেন, নিজের ধর্মই ঠিক থাকিবে অপরাপর সব লুপ্ত হইয়া যাইবে তিনি সত্যই দয়ার পাত্র। তাঁকে এই বলে সতর্ক করে দিচ্ছি প্রত্যেক ধর্মের পতাকাতলে শীঘ্রই লিখিত হচ্ছে—বিবাদ নয় সহায়তা, বিনাশ নয় পরস্পরের ভাব গ্রহণ, ভাল দিকটা নেওয়া।" সারদা মা বলতেন, শান্তি চাও তো মা পরের দোষ দেখবে না, দোষ দেখবে নিজের, সকলকে আপন করে নিতে শেখ কেউ তোমার পর নয়। মতবিরোধ নয়, সমন্বয় এবং শান্তি।" স্বামীজি আরো বলতেন, "সারা পৃথিবীকে দুই হাজার বৎসরের আধ্যাত্মিক খোরাক দিয়ে গেলাম"—অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান এমন এক বস্তু যা আমাদের দুঃখকে চিরতরে লাঘব করতে পারে, অপরাপর জ্ঞানগুলি ক্ষণিকের জন্য চাহিদা মিটাতে পারে। স্বামীজি বলতেন, "Go to hell for the salvetion of others. Selfishness is the great seen unselfishness is God. Liberation is only for him who gives up every thing for others. There is no mukti on earth to call my own. They alone live who live for others the rest are more dead than alive." পরের মুক্তির জন্য লক্ষ নরকে চলে যাও। স্বার্থপরতা মহা পাপ অস্বার্থপরতাই ভগবান, মুক্তি তার জন্য, যে সব কিছু পরের জন্য দিয়েছে। যারা নিজের জন্য মুক্তি চাইবে জীবনেও তাদের মুক্তি হবে না। তারাই বেঁচে থাকে যারা পরের জন্য বাঁচে। বাকিরা জীবন থাকতেও মৃত। কিন্তু "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" অর্থাৎ অমৃতের সন্তান। স্বামীজি বলতেন, "All power is within you, you can do anything and everthing as you like." সমস্ত শক্তি দিয়ে ভগবান আমাদের পাঠিয়েছে। ইচ্ছাটা যদি সৎ হয়, আমার যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। আমৃত্যু পরের জন্য কাজ করে যাও। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি আমার স্থূল শরীরে চলেও যায়, আমার শক্তি তোমাদের সঙ্গে কাজ করবে। এ জীবন আসে এবং যায়—সংসারী কীটের মতো মরার চেয়ে পরের জন্য কর্তব্য কর্ম করে করে মরাও অনেক শ্রেয়। Duty করলে Beauty বাড়ে। স্বামীজি বলতেন, "আত্মানং মোক্ষার্থাং জগদ্ধিতায় চ।" অর্থাৎ আত্মার মুক্তি ও জগতের কল্যাণই হন আদর্শ। আমাদের মনে রাখা

উচিত আমরা জগতের কাছে ঋণী, জগৎ আমাদের কাছে কিছু চায়নি। এটা একটি বিশেষ সুযোগ করে দিয়েছে। জগৎকে সাহায্য করা মানে নিজেকে সাহায্য করা।

স্বামীজি তাঁর মা এবং তাঁর দুই ভাই যেন দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় তার জন্য ঠাকুরকে ধরে বসলেন। স্বামীজি ঠাকুরকে বললেন, "আপনি একটু আপনার মাকে (ভবতারিণী মা) বলে দেন না আমার মা এবং দুই ভাই যেন দু'বেলা দু'মুঠো ডাল-ভাত পায়। ঠাকুর বললেন, "তুই যা না আজ মঙ্গলবার মার কাছে যা চাইবি তাই পাবি।" স্বামীজি বললেন, "আপনি বলুন মা আমার কথা শুনবে না।" ঠাকুর—"বলছি তুই যা না যা চাইবি তা পাবি", স্বামীজি অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভবতারিণী মায়ের নিকটে গেলেন—চাইলেন কী! "মা ভক্তি দাও, বৈরাগ্য দাও, বিবেক দাও।" মায়ের নিকট স্বামীজি কী চাইতে গেলেন আর কী চাইলেন। রামকৃষ্ণদেব ভগবানের কাছে চাইতেন মা আমাকে তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও। স্বামীজিও তাই চাইলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—"কিরে চাইলি!" স্বামীজি বললেন, "মার কাছে গিয়ে সব ভুলে গেছি।" সেকি আবার যা এভাবে তিনবার। মা'র নিকট বিষয়-বুদ্ধি চাইতে পারলেন না। ঠাকুর বললেন, "যা তোর আর কোনোদিন মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।" ওইদিনই কথামৃত লেখক শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত (মাস্টার মশাই) স্বামীজির মায়ের হাতে ৩০০ টাকা দিয়ে এসেছিলেন। তারপর থেকে তাঁর বাড়িতে আর কোনোদিন অভাব হয়নি।

স্বামীজি ঠাকুরকে অনেকরকম ভাবে পরীক্ষা করতেন। কোনো সময় বিছানার তলায় টাকা ঢুকিয়ে রাখতেন, কখনো গরম কলকে দিয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে সমাধি ঠিক কি না পরীক্ষা করে দেখতেন। ঠাকুর তার উত্তরে স্বামীজিকে বলেছিলেন, "তুই কেন আসিস, তুই আমাকে মানিস না। আমাকে কত রকম পরীক্ষা করিস। সেদিন চামচিকিকে বললি চাতক।" স্বামীজি বললেন, "আমি তোমার কথা শুনতে আসি না। আমি তোমায় ভালবাসি তাই আসি।" ঠাকুর হাউহাউ করে কেঁদে বললেন, "নরেন আমার কাছে কিছু চাইতে আসে না, সে আমায় ভালবাসে তাই আসে।"

স্বামীজি তখন কাশীধামে। খবর পেলেন গুরুভাই বলরামবাবু দেহত্যাগ করেছেন। এই দুঃসংবাদ শুনে স্বামীজি আর অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন। কাশীর পণ্ডিত প্রমদাদাস মিত্র স্বামীজিকে বললেন, "আপনি সন্ন্যাসী হয়ে এত শোকাতুর কেন? সন্ন্যাসীর পক্ষে শোক প্রকাশ করা অনুচিত।" উত্তরে স্বামীজি বললেন, "সন্ন্যাসী হয়েছি বলে কি হৃদয়টাও বিসর্জন দিয়ে দিয়েছি। যে গেরুয়া হৃদয় বিসর্জন দেয় সেই গেরুয়া আমি মানি না। প্রকৃত সন্ন্যাসীর হৃদয় সাধারণ মানুষের হৃদয়ের চেয়েও আরো বড় হওয়া উচিত। যে সন্ন্যাস হৃদয়কে পাষাণ করতে শিক্ষা দেয় আমি সেই সন্ন্যাস গ্রাহ্য করি না।" স্বামীজি আরো বলতেন, "যে সন্ন্যাসীর মনের মধ্যে অপরের কল্যাণ করার ইচ্ছা নেই সে সন্ন্যাসীই নয়।" "বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়, সন্ন্যাসীর জন্ম। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের মর্মভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে বিধবার অশ্রু মোছাতে, পুত্রবিয়োগে বিধুরার প্রাণের শান্তি দান করতে অজ্ঞ-ইতর সাধারণকে প্রাণের উপযোগী করতে সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত করতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।"

স্বামীজি ইহধাম ত্যাগ করেন ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই। সন্ধ্যাবেলায় বেলুড় মঠে নিজের ঘরে ধ্যান করছিলেন। রাত ৯টা ১০ মিনিটে সেই ধ্যানই মহাধ্যানে পরিণত হয়। তাঁর তখন বয়স হয়েছিল ৩৯ বছর ৫ মাস ২৪ দিন। স্থূলদেহের নাশ হলেও যেই শক্তি বিবেকানন্দরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সূক্ষ্মভাবে যা জগতে আজও কাজ করে চলেছে। তাঁর উক্তিগুলি বড় সুন্দর ছিল। "আমি কখনও কাজ থেকে বিরত হব না। সর্বত্র আমি মানুষকে প্রেরণা দিয়ে যাব। যত দিন না প্রতিটি মানুষ বুঝতে পার সে নিজে ভগবান।"

তাঁর বাণী কর্মপন্থা ভারতবর্ষের নবজাগরণকে বিরাটভাবে প্রভাবিত করেছিল। সমগ্র পৃথিবীর জন্য তিনি রেখে গেছেন অমূল্য পথনির্দেশ। অনেক মনীষী তাঁকে আধুনিক ভারতবর্ষের স্রষ্টা বলে মনে করেন। এই প্রসঙ্গে চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীর উক্তি স্মরণীয়—"আমাদের আধুনিক ইতিহাসের দিকে তাকালে যে কেউ দেখতে পাবেন আমরা স্বামীজির কাছে কত ঋণী। ভারতের আত্মমহিমার দিকে ভারতের নয়ন তিনি উন্মীলিত করে দিয়েছিলেন। তিনি রাজনীতির আধ্যাত্মিক ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন। আমরা অন্ধ ছিলাম। তিনি আমাদের দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনিই ভারতের স্বাধীনতার জনক—আমাদের রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার পিতা।"

স্বামীজি একবার নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন—"আমি Condenses India"—ভারতের ঘনীভূত রূপ আমিই। ভারতকে ভালবেসে স্বামীজি হয়ে উঠেছিলেন স্বয়ং ভারতবর্ষ।

নিবেদিতা সেই কথাই বলেছিলেন। ভারতবর্ষ ছিল স্বামীজির গভীরতম আবেদন কেন্দ্র। ভারতবর্ষ নিত্য স্পন্দিত হত তাঁর বুকের মধ্যে, প্রতিধ্বনিত হত তাঁর ধমনীতে, ভারতবর্ষ ছিল তাঁর দিবাস্বপ্ন—রক্ত-মাংসের গড়া ভারত-প্রতিমা। ভারতের আধ্যাত্মিকতা, তাঁর পবিত্রতা, তাঁর প্রজ্ঞা, তাঁর স্বপ্ন এবং তাঁর ভবিষ্যৎ সবকিছুর তিনি ছিলেন প্রতীক পুরুষ। স্বামীজির জীবনী পড়লে সেইজন্য মনে হয় ভারতবর্ষের গর্বে এত গর্বিত আর বুঝি কেউ হননি। ভারতবর্ষের দুঃখে এত বেদনা আর কেউ বুঝি পাননি। আবার ভারতবাসীর অক্ষমতায় এত নির্মম কশাঘাত বুঝি আর কেউ করেননি। কারণ ভারতবর্ষকে এত আপনার করে আর কেউ চেনেননি। মা যেমন সন্তানের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, দুর্বলতা প্রয়োজন বিপদ এবং সম্ভাবনার কথা সন্তানের নিজের চেয়ে বেশি করে জানেন ঠিক তেমনিভাবে স্বামীজি ভারতবর্ষকে চিনেছিলেন। তাই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের একটি পরিপূর্ণ ছবি তাঁর চিন্তায় রূপ পেয়েছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এইজন্যই রোমাঁ রোলাঁকে বলেছিলেন, "যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও তো বিবেকানন্দ পড়ো।"

স্বামীজির আহ্বান সকলের প্রতি—"As you have come into the world leave some marks behind, otherwise where is the difference between you and the trees and the stone." অর্থাৎ জগতে যখন এসেছিস একটা দাগ রেখে যাও। না হয় গাছপালা পাথরও তো জন্মাচ্ছে, না হলে মানুষের আর পাথরের সঙ্গে কি তফাৎ রইল। স্বামীজি বলতেন, "Him I call a Mahatman whose heart bleeds for the poor otherwise he is a duratman." তাকেই মহাত্মা বলি যার হৃদয় থেকে গরিবের জন্য রক্তক্ষরণ হয়, না হয় সে দুরাত্মা। তাই স্বামীজির কৃপায় আসুন। —আমরা সকলে সমাজের কাজ করে মহাপুরুষ হয়ে যাই। জয় স্বামীজি, ওঁ শান্তি।

With Best Compliments From :

RAINBOW PRAKASHAN

Publisher & Book Sellers

206, Bidhan Sarani
Kolkata-700 006
Mobile : 7044009798

With Best Compliments From :

বাবলি প্রকাশনী

(নির্ভুল পুস্তক প্রকাশই আমাদের বৈশিষ্ট্য)

৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭৩
দূরভাষ : ২২৪১-৯৪৯৪

মাতৃভক্তি সাধনা

স্বামী বেদানন্দ

আমাদের চোখের সামনে যে জগৎ দেখছি তা অতি বিস্ময়ে ভরা। পৃথিবী তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা আমাদের সকলকে ধরে রেখেছে। আকাশের দিকে উড়ে যেতে দিচ্ছে না। অথচ কী আশ্চর্য! সূর্য আবার পৃথিবীকে আকর্ষণ করে তার চারপাশে ঘোরাচ্ছে। আর আমরাও পৃথিবীতে চেপে মহাব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকাল ধরে ঘুরপাক খাচ্ছি। ঠিক কতকাল ঘুরপাক খাচ্ছে পৃথিবীটা? বিজ্ঞান বলে, সাড়ে চারশো কোটি বছর আগেই নাকি পৃথিবীটা সৃষ্টি হয়েছিল অর্থাৎ দূরন্ত আগুনের সমুদ্র থেকে একটা টুকরো খসে গিয়ে নির্দিষ্ট কক্ষেই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। সেই সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে ছিল না কোনো পৃথিবী। ছিল না এই নীল আকাশ, সাদা মেঘের ভেলা, নীল সমুদ্র, সবুজ অরণ্য, মনোলোভা চাঁদ, স্পর্শ শীতল বাতাস, রঙ বেরঙের ফুল, ফল, শিশুর হাসি—না, কিছুই ছিল না। বিজ্ঞান বলে, পৃথিবী যখন আগুনের গোলা হয়ে সূর্যের চারপাশে ঘুরছিল তখনই আর একটা বড় গ্রহের মতো বস্তু এসে পড়ল পৃথিবীতে এবং ক্ষণেই তা পৃথিবী থেকে ছিটকে গিয়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ টানেই তাকে ঘিরে ঘুরতে লাগল। এই হল চাঁদ। আর এই সূর্য-চাঁদ ও পৃথিবী মিলে শুরু হল এক অদৃশ্য বিবর্তনের খেলা। যার ফলে আমাদের বসুন্ধরা মাতায় সেজে উঠল আকাশ, বাতাস, জল, স্থল, পর্বত, অরণ্য, গাছপালা, প্রাণী, মানুষজন, মানুষের মন, বুদ্ধি এবং বুদ্ধির পরিচালক চেতনা—আরো কত কী! সবই যেন এক মহাশক্তির খেলা। সবকিছুর অন্তরালে খেলা করছে এক প্রাণময়ী মহাশক্তি যার রয়েছে জ্ঞান, যার রয়েছে ইচ্ছা এবং যার রয়েছে সবকিছু ভেঙে গড়ে তিলে তিলে কাজ করার অফুরন্ত শক্তি। এই জ্ঞান-ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি যেমন প্রতি জীবে জীবে বর্তমান, তেমনি মহাব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে মূল প্রাণকেন্দ্র রূপেও তা বিরাজ করছে চিরন্তন, অবিচ্ছিন্নভাবে—এই সমষ্টি জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির পরিচালিকার নাম হল হিরণ্যগর্ভা জগৎমাতা যিনি অনন্তশক্তিময়ী, জ্ঞানময়ী, প্রেমময়ী, করুণাময়ী—যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের স্থূলে, সূক্ষ্মে ও কারণে সবকিছুই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করছেন। এই চৈতন্যময়ী মহাশক্তির নাম হল 'মা'—এঁকে ভক্তি করাই হল মাতৃভক্তি। এই 'মাতৃশক্তি' হল পরম চেতন পুরুষ ঈশ্বরের শক্তি—মহামায়া—ইনিই সর্বকারণের কারণ, জগৎ ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনার মূল চালিকা শক্তি। এঁর জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, ধ্বংস নেই, বিনাশ নেই। ইনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়ী চিন্ময়ী মহাশক্তি মা যিনি মঙ্গলময়ী, জ্ঞানদায়িনী মা মহামায়া যাঁকে আমরা দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি নানা মাতৃদেবীরূপে উপাসনা করে থাকি এবং তাঁদের চরণতলে নিজেদের সমর্পণ করতে চাই।

।। মহাকাশ, চৈতন্যময়ী মা ও পরব্রহ্ম ।।

আমরা যেমন পৃথিবী গ্রহে চেপে সূর্যের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ঠিক তেমনি সূর্যও তার গ্রহদের নিয়ে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্যকে ঘুরতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন বা এক বছর কিন্তু আমাদের সবাইকে নিয়ে সূর্য তার জন্মদাতা মা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরতে কত সময় নেয় বলুন তো? ২২০ মিলিয়ন বছর। এটা ঠিক কেমন? না—ভাবতে থাকুন ১০ লক্ষতে হয় এক মিলিয়ন। অর্থাৎ ২০ কোটি বছর।

আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে কত দূরে আছে আমাদের সূর্য? ৩০ হাজার আলোকবর্ষ দূরে অর্থাৎ আমাদের সূর্য সহ পৃথিবী গ্রহটা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ধারে আছে। এই মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে আমাদের সূর্যের মতো প্রায় ২০ হাজার কোটি সূর্য

আছে। এইরকম হাজার হাজার কোটি সূর্য নিয়ে তৈরি হয় এক-একটি গ্যালাক্সি। আর লক্ষ লক্ষ গ্যালাক্সি নিয়ে তৈরি হয়েছে এক-একটি ব্রহ্মাণ্ড। এমন অগণিত ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে তৈরি হয়েছে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড। আর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই একই মহাকাশে ঘুরছে—যে মহাকাশের ভেতরে পৃথিবী গ্রহের একটি ঘরে আপনি লেখাটি পড়ছেন—ভাবা যায় মায়ের কী লীলা! আরো বিস্ময়ের ব্যাপার যিনি আপনাকে, আমাকে—এই পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন সেই চৈতন্যময়ী মহাশক্তি মা স্বয়ংই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তৈরি করে অহরহ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সম্পন্ন করছেন। ভাবছি মায়ের হৃদয় তাহলে কত বড়? কত বড় মহাশক্তি ইনি! যাঁর উদরে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঘুরপাক খাচ্ছে! মুহুর্মুহু সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হচ্ছে—কী সুন্দর মাতৃসাধক রামপ্রসাদের এই গানটির মধ্যে এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে দেখুন—

"সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে শ্যামা এমনি মেয়ের মেয়ে
যার নাম জপিয়ে মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে মা কটাক্ষ হেরিয়ে
আবার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে।
যে চরণে শরণ লয়ে দেবতা বাঁচেন দায়ে
আবার দেবের দেব মহাদেব যাঁর চরণে লুটায়ে।"

কাজেই দেবতা তো বটেই—এমনকি সাধনার শেষে সব মহাপুরুষও মায়ের চরণে লুটোপুটি খায়। কারণ সমস্ত সিদ্ধি, শক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিদ্যা, প্রেম, করুণা,যশ, কীর্তি সবই মায়ের পদতলে লুটোপুটি খাচ্ছে। যেখানে মায়ের কৃপা সেখানেই এগুলি এসে হাজির হয়। তাই মা হলেন অন্নপূর্ণা এবং শিব হলেন সাক্ষাৎ পরমেশ্বর কিনা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর মাতৃকৃপা করুণার আশ্রয় নিয়ে মুক্তি ভিক্ষা করছে। এমনিই মায়ের অপরূপ লীলা! এমনি তাঁর অলৌকিক প্রেম ও করুণাশক্তি।

যাহোক, আমরা যদি ব্যস্ততম মায়ার জগৎ থেকে চোখ তুলে ধ্যাননেত্রে দেখি তাহলে উপলব্ধি করব যে, এই মহাকাশে সবাই ছুটে চলেছে। পৃথিবী সূর্যকে ঘণ্টায় ১ লক্ষ ৮ হাজার কিমি বেগে প্রদক্ষিণ করছে। সম্পূর্ণ হচ্ছে ৩৬৫ দিনে। পৃথিবী নিজ অক্ষপথে ঘুরছে ঘণ্টায় ১৭৬৯ কিমি বেগে। ২৪ ঘণ্টায় ঘোরা সম্পূর্ণ। সূর্য সেকেন্ডে ১৫০ মাইল বেগে ছুটছে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির চারপাশে। একবার ঘোরা সম্পূর্ণ করতে লাগে ২০ কোটি বছর। কাজেই পৃথিবী চলছে, অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহরা সূর্যকে কেন্দ্র করে চলছে, ধূমকেতু চলছে, নক্ষত্র চলছে, ছায়াপথ-গ্যালাক্সি চলছে মহাকাশের বুকে। এ তো গেল বৃহৎ আকাশের বুকে চলাচলি। আবার ক্ষুদ্র দেহকোষে এবং ক্ষুদ্র পরমাণুর ভেতরে প্রোটনের চারিদিকে সর্বত্র ইলেকট্রন অবিরাম ঘুরছে। পরমাণু কেন্দ্রে আবার প্রোটন, নিউট্রন অবিরাম ছোটাছুটি করছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ ছোট-বড় সবাই ছুটছে। এই ছুটে চলা এই গতিই হল জগৎ—'জগৎ' মানে শুধুই চলা। এই পৃথিবী গ্রহে একদল মানুষ আসছে আবার চলে যাচ্ছে। সব আসছে কিনা সৃষ্টি হচ্ছে, কিছু বছর থাকছে স্থিতি হচ্ছে এবং চলে যাচ্ছে বা প্রলয় ঘটছে কিন্তু রহস্যের কথা হল যিনি সৃষ্টি-স্থিতি ও লয় ঘটাচ্ছেন সেই মহাশক্তি কিন্তু চির প্রশান্ত, ধীর ও স্থির—তাঁর চৈতন্যের তো ক্ষয় নেই, বৃদ্ধি নেই, ধ্বংস নেই—এই চৈতন্যময়ী হলেন বৃহত্তর অখণ্ড চেতনা যাঁকে 'ব্রহ্ম' নামে ডাকা হয়। কার্যত 'ব্রহ্ম এবং বৃহত্তর চৈতন্যশক্তির' কোনো পার্থক্য নেই। যেমন অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি, জল ও তার তরল শক্তি। যখন বৃহত্তর চেতনা প্রেম, করুণা, দয়া, ক্ষমা, কর্মফল বিধানের কর্ত্রী হয়ে কর্ম করেন তখনই তা 'মা' নামে অভিহিত হয়। এই 'মা'ই আবার সর্বভূতের জন্মদাত্রী উপাদানকারণ এবং প্রাণীকুলের আপন আপন গর্ভধারিণী। আমাদের নিজ নিজ মাতা। যা ব্যাপক ভাবে আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে স্নেহ-মমতা-করুণা বুকে নিয়ে নিজ নিজ মা হয়ে, সেই তিনিই আবার সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণকেন্দ্রে 'হিরণ্যগর্ভা মা' নামে মহাজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। ব্যষ্টিতে যা চেতনা দ্বারা হচ্ছে, সমষ্টিতে তাই চৈতন্য দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে। এই 'চেতনা ও চৈতন্যের' পার্থক্য কী? চেতনা মানে আপনি নিজ মনকে যে জিনিস দ্বারা দেখছেন তাই—সাক্ষীস্বরূপ জীব আত্মা। আর চৈতন্য মানে? চৈতন্য হল হিরণ্যগর্ভের সাক্ষীস্বরূপ সর্বব্যাপী গুণাতীত পরমাত্মা বা আধারবিহীন অখণ্ড সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা যাঁকে 'ঈশ্বর' বা 'পরমেশ্বর' নামে ভাবা হয়। এই পরমেশ্বরই সত্ত্বগুণের প্রভাবে দয়াময়ী, করুণাময়ী হয়ে 'জগৎমাতা' নাম গ্রহণ করে ভক্তদের কৃপা করেন। চতুর্বর্গ ফল প্রদান করেন। মাতৃভক্তি সাধনা দ্বারা এই পরমেশ্বরীকে তুষ্ট করতে হবে। তবেই তিনি মায়ার দ্বার ছেড়ে দিয়ে সাধক সন্তানকে পূর্ণতা প্রদান করবেন।

'আকাশ' হল চোখের সম্মুখে যা দেখছি শূন্যতা—যেখানে বাতাস চলাচল হচ্ছে, সমস্ত বস্তু বিষয় ধারণ করে রয়েছে, আর মহাকাশ হল এই অখণ্ড আকাশ যার কোনো শেষ নেই। রহস্য হল 'আকাশ ও মহাকাশের' কোনো ভেদ নেই—যা আকাশ, তাই মহাকাশ। এই 'মহাকাশ ও মহাবিশ্ব' হল একই মুদ্রার এপিঠ ও ওপিঠ। মহাকাশ হল অসীম শূন্যতা এবং মহাবিশ্ব

● দুর্গতিহারিণী মা দুর্গা।

হল তার উপর নানা বস্তুনিচয়ের ভাঙা-গড়ার মধ্যে সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশশীলতা। এ এক অবিচ্ছেদ্য নিত্য ও লীলাখেলা। মহাকাশেই জন্মেছে গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, গ্রহ, পৃথিবী, জল, মাটি, বাতাস, মানুষজন, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, সংস্কার, ভাল-মন্দ, নিম্নপ্রকৃতি, ঊর্ধ্বপ্রকৃতি সবকিছুই—'আকাশ ও চেতনা' যেন পাশাপাশি চলছে। অনন্ত অখণ্ড চেতনা মহাকাশে সৃষ্টির জাল বুনেছে। সেখানে কিছুদিন থাকছে, আবার বিলয় হয়ে যাচ্ছে।

আমরা মহাকাশে চলবান রয়েছি সত্য, কিন্তু আমাদের চেতনা সেই সৃষ্টিকারিণী 'চৈতন্যময়ী'র খোঁজ রাখে না? কেন রাখে না, না—মায়েরই মায়া আবরণ গ্রাস করেছে মনে। সোজা কথায় সত্ত্ব, রজো ও তমোপ্রকৃতি নিয়ে সৃষ্টি হয় জগতের মনবুদ্ধি সহ সমস্ত কিছু—তার মধ্যে 'তামসিকতা ও রাজসিকতা' বেশি থাকলে চেতনা সংকুচিত হয়ে যায়, ভোগপরায়ণ হয়ে যায়, পাপিষ্ঠ হয়ে যায়, অহংকারী হয়ে যায়। ফলে সেই ক্ষুদ্র মনবুদ্ধির চেতনা নিয়ে এই জগতের নিয়ন্ত্রণী পরমেশ্বরী জগন্মাতাকে জানা সম্ভব হয় না।

ভাবতে হবে 'মহাকাশ' ও 'ব্রহ্মচেতনা' এক ও অভিন্ন সত্য। 'ব্রহ্ম' মানে অনন্ত বিস্তারিত ভাব—যার স্থান নেই, কাল নেই, সময় নেই, জন্ম নেই, ধ্বংস নেই কিনা যা কালাতীত, দেশাতীত, অবিনশ্বর, অনন্ত বৃহৎ সত্তা—এই সত্তা জড় কিছু নয়, এঁর কখনো সৃষ্টি হয় না, ইনি সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশরহিত অনন্য চৈতন্য যা এক ও অখণ্ড। এই ব্রহ্মচেতনাকে বোধে বোধ করতে হয়। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই ব্রহ্মচেতনায় যখন সত্ত্বগুণজাত অনন্ত প্রেম ও করুণা সংযুক্ত হয়ে যায় তখনই তা শুভ শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

আমরা যেমন আমাদের হৃদয়বৃত্তি বৃদ্ধি করে অনেকের প্রতি ভালবাসা, দয়া ও করুণা অনুভব করি, ঠিক তেমনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণকেন্দ্রে মায়ের অনন্ত প্রেম, দয়া, করুণা ও শুভশক্তি বিদ্যমান রয়েছে। এই অনন্ত শক্তিই ঈশ্বরের—এই শক্তিস্বরূপিণী অনির্বচনীয় সত্তাই হল চৈতন্যময়ী মা—যাকে পার্থিব 'দেবাসুর' সংগ্রামের আলোকে মা দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী নামেই আমরা চিন্তাভাবনা করি। কার্যত উনিই সেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের শক্তিস্বরূপিণী জননী যিনি চিৎশক্তি দ্বারা সর্বব্যাপ্ত হয়ে আছেন। যেমন 'ব্রহ্ম' ভাবলেই পুরুষ, সনাতন, নিত্য, অবিনশ্বর বোঝায়—তেমন 'শক্তি' ভাবলেই গতি বোঝায়। সেই গতিশক্তির ত্রিগুণ অংশকেই সত্য সনাতনী ব্রহ্মময়ী মা বলা হয় যিনি আপন আনন্দদায়িনী আত্মশক্তি বলে ঈশ্বরের সঙ্গে সদা অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে রয়েছেন—এই ভাবটিতে তন্ত্রের 'শিবরূপ শবের উপর কালীর সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয়ের' ক্রিয়ার কথা বোঝানো হয়েছে।

বস্তুত 'শিব ও শক্তি' এঁরা কেউ কাউকে কখনোই ছাড়তে পারবে না। কারণ শিব হল আধার—আধার ছাড়া কখনো 'শক্তি'র কার্যকারিতা দেখা যায় না। শক্তিমান ছাড়া শক্তির ধারণা সম্ভব নয়। শিব ছাড়া শক্তি নেই, আবার শক্তি বিনা শিব শব, ক্রিয়াহীন। কোনো কাজে লাগে না। কাছে শক্তিকেই—'মা' বলে ডাকা হচ্ছে, তিনি চৈতন্যময়ী—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী এবং ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সহ সংসারের সবকিছুর বিধানকারিণী। এই শক্তিরূপিণী মা-ই আদ্যাজননী, যিনি সৃষ্টির সবকিছুর ঊর্ধ্বে বিশুদ্ধ 'চৈতন্যময়ী' রূপে নিরন্তর বিরাজ করছেন এবং তিনিই এই সৃষ্টির সঙ্গে এক রহস্যময় সম্পর্ক স্থাপন করে এর সবকিছুই পরিচালনা করছেন, কখনো ভাঙছেন এবং আবার কখনো পুনর্গঠন করে চলেছেন—এই যা কিছু দেখা যায় সবকিছুর অন্তরালে তাঁর অনন্ত চেতনাই কর্ম করে চলেছে, চিন্তা করে চলেছে এবং সবকিছু জিনিসেই তিনি অখণ্ড চৈতন্যময়ী মা রূপে নিত্য বিরাজ করছেন।

।। মায়া, মহামায়া ও চৈতন্যময়ী মা ।।

এই চোখের সম্মুখে যা কিছু দেখছি যেমন আকাশ, বাতাস, সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, পৃথিবীর বৃক্ষসকল, সমস্ত জিনিসপত্র—এসবের কি কোনো নাম আছে? মানে 'সব বস্তু ও বিষয়ের' নামগুলি কি বস্তুতে আছে, না—মনে আছে? জানি বলবেন—আপনার মনে আছে। ঠিক তাই—জগতের সমস্ত বস্তু, বিষয় এবং সবকিছুর নাম আপনার মনে কিনা 'চিত্তে' সংস্কার আকারে গুপ্ত আছে।

এই সংস্কার দুই ভাগে বিভক্ত 'বিদ্যার সংস্কার ও অবিদ্যার সংস্কার'। অবিদ্যা সংস্কারই মায়া—যখন এটা ব্যক্তিকে আশ্রয় করে থাকে এবং সঠিক সত্য দেখতে বাধা দেয়, তখনই এর নাম হল মায়া বা অজ্ঞান। আর যখন এটা সামগ্রিকভাবে আবরণ করে দেয় তখন তাকে 'মহামায়া' বলে। তাহলে 'মায়া ও মহামায়া' হল ব্যষ্টি ও সমষ্টিভেদের দুটি নাম মাত্র। কার্যত দুটি এক ও অভিন্ন সত্য—শুধু ভাবনার উপরই বিভেদ তৈরি হয়।

যাহোক, শক্তিশাস্ত্র শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলা হয় যে, এই চৈতন্যময়ী শুদ্ধসত্ত্ব দেবীই তাঁর 'তমো ও রজো গুণ' দ্বারা মায়া সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর অনন্ত মায়া দড়িতে সব জীবকে—মানে

মানুষজনের মনকে বেঁধে ফেলেছে। এই মহামায়াই মায়া রহস্য বলে বিশ্বপ্রপঞ্চ দেখাচ্ছেন জীবকে—মানে আমাদের মতো সন্তানদের—এই মহামায়ার রজো তমোগুণের প্রভাবেই মনের বিকার সংস্কার জন্ম নেয় এবং তার ফলে আমরা জীবনের চারপাশের অনন্ত বস্তু ও ঘটনাকে যথাযথ দেখতে সক্ষম হই না। সবই উল্টা দেখি। যেমন যখন আমরা জল দেখি, তখন বরফ দেখি না, যখন বরফ দেখি তো তার ভিতরে জল দেখি না, আবার যখন জল দেখি তো তার ভিতরে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের পরমাণু দেখি না, আবার যখন বোধশক্তি দিয়ে পরমাণুর চিন্তা করি তো তখন সেই পরমাণুর ভেতর চৈতন্যময়ী চিন্ময়ী দেবীর কথা ভাবি না, যদিও জেনেছি যে, চেতনারূপে দেবীই সর্বভূতে সূক্ষ্মতম রূপে বসবাস করছেন। আমরা অনুভব করি না, কারণ মায়ের স্বরূপ তিনিই আমাদের দুর্ভেদ্য করে রেখেছেন। বস্তুত মহামায়া আমাদের সকলের চিত্তের ভেতরে মলিনতা দিয়ে জগতের ভোগ্যবস্তুগুলির প্রতি এক গভীরতম আসক্তি সৃষ্টি করেছেন। এ কারণে আমাদের মন ভোগ করতেই দৌড়ায়—ভোগ্যবস্তুর অন্তরালে যে চৈতন্যশক্তি বিরাজমান রয়েছে—তার আর খোঁজ রাখি না। এই ভুলে যাওয়ার ফলেই মানবজীবনে চারদিকে এত দুঃখ, যন্ত্রণা, বেদনা, বিভীষিকা ও কালো ছায়া সর্বত্র গ্রাস করেছে।

প্রশ্ন হল—এই মহামায়া কোথায় ছিল? এই মহামায়া কখনোই কোথা থেকেও আসেনি। ইনি অনাদি এবং অবিচ্ছিন্নভাবে পরমপুরুষ ঈশ্বরের শক্তিরূপে বাস করেন। এই মহামায়া হল সেই মহাশক্তিময়ী চৈতন্যময়ীর এক অবিচ্ছিন্ন সত্তা যে সত্তার দ্বারা স্বয়ং জগন্মাতা সৃষ্টি-স্থিতি ও সংহার পরিচালনা করছেন, জীবকে জ্ঞান দিচ্ছেন, অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছেন। যেমন 'দেবীসূক্তে' বলা হয়েছে যে, "দেবতা ও মানুষের দ্বারা চাওয়া সেই 'ব্রহ্মজ্ঞান' আমি নিজেই উপদেশ করে থাকি এবং প্রদান করে থাকি। আমি যাকে যেমন ইচ্ছা তৈরি করি—কাউকে সর্বশ্রেষ্ঠ করি, কাউকে ব্রহ্মা করি, কাউকে ঋষি করি, কাউকে-বা অতি মেধাবান করি যাতে ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণ করতে পারে।" কাজেই দেখা যাচ্ছে, মা চৈতন্যময়ী হলেন সবকিছুর বিধাতা তিনিই এই জগতের সমস্ত কিছুতে এবং জগৎব্যাপী মায়াপ্রপঞ্চের উর্ধ্বে সর্বব্যাপী চৈতন্যরূপে সদা বিরাজমান রয়েছেন। তাঁর এই সর্বব্যাপী চৈতন্যরূপকেই বলা হল ব্রহ্মরূপ—তিনিই 'ব্রহ্ম' রূপে সবকিছুর মধ্যেই বিরাজমান। কিন্তু রহস্য হল—মায়াপ্রকৃতি আশ্রয় করে তিনিই আবার জীবের অন্তঃকরণে লুকিয়ে আছেন এবং নামহীন অরূপ 'ব্রহ্মকে' নাম দিয়ে ডেকে, ভালবেসে, জড়িয়ে সুখ-দুঃখ ভোগ করছেন, কী অদ্ভুত মায়ের মায়ালীলা, তাই না?

তাহলে এটা ভাবতে হবে যে, জলের যেমন ঠাণ্ডা দ্রব্যগুণ আছে, তরলতা আছে, প্রবাহমানতা আছে ঠিক তেমনি মহামায়ার 'সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসী' গুণ আছে—এই গুণগুলির সঙ্গে মহামায়া অভিন্ন। এর মধ্যে 'রাজসিকী ও তামসিকী' গুণ দ্বারা জগৎমাতা সংসার লীলা করাচ্ছেন যা সংকীর্ণ ও স্বার্থপরতাপূর্ণ এবং দুঃখ-যন্ত্রণায় ভরা। অপরদিকে মা 'সাত্ত্বিকী' প্রকৃতি বিকাশের মধ্য দিয়ে জীবকে ভগবানের অনন্ত ভাবময় রাজ্যে তথা সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া, ভালবাসার জগতে নিয়ে যাচ্ছেন। এই দেবভাব বিকাশ যা অন্তঃকরণে হয়ে থাকে তাকেই ধর্ম বলে। এই ধর্মভাবপূর্ণ হলেই ঈশ্বর লাভ হয় কিনা জীব জগৎমাতার আত্মানন্দে কোলে উঠে বসে।

প্রশ্ন হল—যখন অবতার আসেন তাঁদের সাথে মায়া, মহামায়ার কি সম্পর্ক থাকে? ভাবতে হবে—মহামায়াই জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণা দিয়ে চিত্তবৃত্তিকে ঊর্ধ্বমুখী করতে প্রেরণা দেন। 'দেবী' মানে দ্যোতনশীলা কিনা যিনি নানা বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করে জীবকে ক্রন্দন করিয়ে বিবেকশক্তিকে জাগ্রত করেন। তখন ভোগমুখী মানুষের মন জগৎমাতার দিকে দৃষ্টি দেয় এবং তাঁকে প্রাপ্ত করার কথা চিন্তা করে। মায়া ও মহামায়া জীবকে নিয়ে এবং অবতারপুরুষরা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ যোগমায়া অবলম্বন করে লীলা করে। অর্থাৎ মায়া 'সাত্ত্বিকী' প্রকৃতি নিয়ে চলে অবতারলীলা।

এই মহাশক্তিময়ী মহামায়া কেবল বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের উপরেই শুধু প্রভাব বিস্তার করেন না, তিনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের উপরও সমস্ত প্রভাব ধরে রেখেছেন। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কারো কিছু হবার নয়। তিনিই জগতের প্রাণকেন্দ্র, ভরকেন্দ্র, হৃদয়কেন্দ্র—জগতের যত সংস্কার, চিন্তাভাবনা ও কর্ম এবং কর্মফল আছে সবই অদৃশ্যভাবে তাঁরই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যখন বিশ্বের কোনো অংশে প্রলয় হয় তখন সবকিছু পরমাণু স্বরূপ হয়ে যায় এবং সেই আদ্যাশক্তি মহামায়াই তখন যোগনিদ্রা রূপে সৃষ্টির বীজ বুকে নিয়ে অবস্থান করেন। এটাকেই রূপকের ভাষায় বলা হয় নারায়ণ যোগমায়া অবলম্বন করে কারণসমুদ্রে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে অবস্থান করছেন।

এই মহামায়ার তিনটি অনন্য রূপ—প্রথম মহাকালী যিনি সমস্ত খণ্ডকাল চেতনা ও চিন্তাভাবনাকে অনন্ত মহাকালের বুকে

কিনা পরমাত্মার মধ্যে স্থাপন করেন যাকে 'মোক্ষলাভ' বলে সহজ ভাষায় অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয়ত, মহালক্ষ্মী—যিনি সর্বত্র শ্রী ও সমৃদ্ধি দান করেন। সবকিছু ইতিবাচক শক্তির জন্মদাত্রী হলেন লক্ষ্মী যাঁর শান্ত ও স্নিগ্ধতার মধ্যে দিব্য ভাবের অপূরণীয় প্রকাশ ঘটে এবং তৃতীয়টি হল মহাসরস্বতী যা জীবের অন্তঃকরণে পরমজ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়ে আত্মজ্ঞান তথা মানবজীবনের আধ্যাত্মিক বিকাশের পূর্ণতা দান করেন। এই তিনটি দেবীশক্তি ভিন্ন নয়—একই চৈতন্যময়ীর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার বিকাশ মাত্র। কাজেই সর্বদা ভাবতে হবে যে, সমস্ত রূপ ও নামের অন্তরালে এক মহাশক্তিরূপিণী মহিমাময়ী দেবীই বিরাজ করছেন যাঁকে 'মা' বলে ডাকলে সহজে ধরা দেন, কৃপা করেন এবং জীবন সংগ্রামের জয়লাভে সর্বদা সহায়তা করেন।

।। মহাশক্তির দৈবীভাব ও আসুরী ভাবের বিকাশ।।

চৈতন্যময়ী মহাশক্তি মায়ের দুটি রূপ—সমষ্টি দেহ ও ব্যষ্টি দেহ। সমষ্টি দেহের অপর নাম বৈশ্বানর কিনা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে এক দেহ হিসাবে ধরে এই নামকরণ হয়েছে। বৈশ্বানর বা বিরাট দেহ যা 'স্থূল ব্রহ্মাণ্ড' নামে খ্যাত। এই স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃকরণের নাম হিরণ্যগর্ভা—আর এই হিরণ্যগর্ভার সাক্ষীস্বরূপ চেতনার নাম ঈশ্বর বা চৈতন্যময়ী পরমেশ্বরী। তাহলে 'জগৎ' বলতে স্থূল (জড়দেহ), সূক্ষ্ম (মনদেহ), সূক্ষ্মতম (বুদ্ধি বা মহৎতত্ত্ব) এবং মহাকারণ (চৈতন্য)-কে বোঝায়। পরব্রহ্মই তাঁর মায়াশক্তি অবলম্বন করে সেজেগুজে এসব হয়ে রয়েছেন।

আপনি যেমন নিজেকে 'একটি' দেহ অনুভব করেন যেখানে রক্ত-মাংস-হাড়গোড়ের দেহের সঙ্গে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় জড়িয়ে রয়েছে—এটা হল স্থূলদেহ। দেহের অন্তরালে চিত্ত-মন-বুদ্ধি ও অভিমান রয়েছে এবং সঙ্গে রয়েছে অজস্র সংস্কার বা চিন্তার সূক্ষ্মকণা আর এইসব মিলিয়ে হল 'সূক্ষ্মদেহ' এবং সূক্ষ্মদেহকে যিনি বুদ্ধির সহযোগে পর্যবেক্ষণ করছে তাকে 'চেতনা' বলা হয়। সেই 'চেতনা' সর্বদা আপনার সঙ্গে জাগ্রত অবস্থায় আছে, স্বপ্নে থাকে এবং সুষুপ্ত অবস্থাতে 'চেতনা' স্বকারণে বিলীন হয় কিনা চৈতন্যময়ী মায়ের সঙ্গে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে থাকে। তাহলে ব্যষ্টি জীবদেহের সূক্ষ্মশরীরের দ্রষ্টা হল প্রাণময় চেতনা এবং সমষ্টিশরীরে প্রাণময় চেতনাকে বলা 'চৈতন্যময়ী' মা—তাই বলছিলাম সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণকেন্দ্রে প্রাণময়ী প্রেমময়ী করুণাময়ী চৈতন্যময়ী মা বিরাজ করছেন জগৎ সৃষ্টির আগে থেকেই—তাঁতে কোনো ক্ষয় নেই, মৃত্যু নেই—এই চৈতন্যময়ী মাকে প্রাপ্ত করতে হবে। তাই ভক্তকে করতে হয় শক্তির সাধনা, মায়ের অনন্ত মহিমাময় ভাবনা সমন্বিত 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' পাঠ—অর্থ বুঝে, ভাব-ভক্তি সহকারে—তবেই যেসব সংকীর্ণ বা আসুরিক বৃত্তি মনকে মলিন করছে তার বিনাশ ঘটবে এবং মনটা শুদ্ধ পবিত্র হয়ে মায়ের জ্ঞানময়ী স্বরূপকে প্রাপ্ত করবে।

যদি আমরা জ্ঞাননয়নে দেখি তাহলে দেখব যে, মায়ের তিনগুণ সমন্বিত প্রকৃতি সবদিক পরিব্যাপ্ত হয়ে বিরাজ করছে। আমরা যখন আমাদের মনের বৃত্তিগুলির উপর নজর রাখি তখন দেখতে পাই বৃত্তিগুলি দুইভাবে সজ্জিত হয়ে রয়েছে—দেবতা ও অসুর বৃত্তি। দেবতা বৃত্তি রূপে সত্য, শ্রদ্ধা, দয়া, মায়া, ক্ষমা, প্রেম, প্রীতি, নিঃস্বার্থপরতা, সেবা, সহিষ্ণুতা, মৈত্রীভাব সহ অসংখ্য দেববৃত্তি চিত্তে বিরাজ করছে। ভগবতীর সাধনা করলে এই দেববৃত্তি বৃদ্ধি পায় এবং সংরক্ষিত থাকে। আর এই দেববৃত্তির বৃদ্ধি থেকেই মানুষ পশুত্ব থেকে দেবত্বে উন্নতি ঘটিয়ে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু আসুরিক বৃত্তি কিছুতেই দেববৃত্তিকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসা, দ্বেষ, দম্ভ, দর্প, অভিমান, অহংকার, মিথ্যাচার, ভোগলালসা, প্রভুত্বপ্রিয়তা, পরপীড়ন প্রভৃতি সবই হল রজো ও তমো গুণের বিকৃত ভাব যা আসুরী ভাব নামে পরিচিত। আমাদের প্রত্যেকের মনে এবং জগতের সর্বত্র এই 'দেবাসুর' ভাবনার ভীষণ যুদ্ধ চলছে—এমনকি সমষ্টিভাবেও এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সর্বদা পরিচালিত হচ্ছে। এটাই হল মায়ের সত্য প্রকৃতি। তবে দেবতার গুণগুলিকে নিয়ে মা আত্মসমাহিতভাবে 'শিব' রূপে অবস্থান করেন এবং ভাল-মন্দ দৈব-আসুরী গুণ নিয়ে 'জীবজগৎ' রূপে আত্মপ্রকাশ করে লীলা করেন। আসুরিক গুণ বৃদ্ধিতে জগতের সাম্যভাব নষ্ট হয়। তখন চারদিকে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, অবিচার, মিথ্যাচার এবং প্রকৃতির কষাঘাত নেমে আসে যা ধীরে ধীরে যেন মহাপ্রলয়ের দিকে নিয়ে যায়। অপরদিকে আত্মসমাহিতভাবে সৎ ভাবনা নিয়ে বিচরণ করলে জীব সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ শিবরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে, মহাপ্রকৃতির মধ্যে 'দৈবীভাব ও আসুরী ভাব' অনাদি কাল থেকেই আছে। দৈবীপ্রকৃতি দিয়েই হয় ঈশ্বরের অবতার লীলা এবং মনুষ্যমনে দেবতার ভাব বিকাশ এবং আসুরী ভাব দিয়ে হয় ধ্বংসলীলা তথা হিংস্র দানবজাতির ক্রমবিকাশ। যদি খোলা চোখে পৃথিবীর মানবজাতির

দিকে দৃষ্টি রাখি তাহলে দেখব যে, সর্বত্র দেবভাবনা ও অসুরভাবনার সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ চলছে।

বস্তুত দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধ বর্ণনায় পরিপূর্ণ হল চণ্ডীগ্রন্থ। যুদ্ধের দুই পক্ষ—দেবতা ও অসুর। অসুরদের বলবিক্রমের কাছে দেবতারা বারবার হেরে যাচ্ছে। কিন্তু দেবতাদের প্রজ্ঞা ও বিনম্রতা তাঁদের বাঁচার প্রেরণা দিচ্ছে এবং প্রেরণা আসছে সূক্ষ্মতম রহস্যে ভরা অনন্ত প্রেমময়ী মায়ের কাছ থেকে। মা অনন্ত সত্য, প্রেম ও করুণার ভাবে বিশ্বাসী। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে রক্ষা করতে চান। গঠনমূলক দেবভাবনার মধ্য দিয়ে সর্বত্র সার্বিক বিকাশ চান। মনের আত্মিক ভাবনা প্রকট হয়ে সর্বত্র মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটুক, সর্বত্র নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও মানবতা ভাবনার জয়যাত্রা হোক—এসব তিনি চান। শান্তি, সম্প্রীতি, প্রেম, সেবা দিয়ে সবকিছু সুন্দর ও শুভ হয়ে উঠুক এই তাঁর ভাবনা। ফলে তিনি দেব-সন্তানদের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁদের হয়ে যুদ্ধে নেমে পড়েন এবং অসুরদের সমূলে বিনাশ করে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুত এ কাহিনির অন্তরালে রয়েছে মানবমনের সহজাত প্রবৃত্তি ও রিপুগুলিকে মার্জিত করার প্রয়াস। মানুষের মনে চলছে রিপুর তীব্র উন্মাদনা—কাম-ক্রোধ-লোভ-ঈর্ষা-দ্বেষের চলবান সংস্কার প্রবাহ যা প্রত্যেক নর-নারীর চিত্তদেশে ছটফট করছে। নারীরা চেতনায় জগৎমাতার সান্নিধ্যে থাকলেও তাঁদের মনোজগতে অবিদ্যার সংস্কার বিরাজ করছে। সেখানে বিদ্যার সংস্কারের সঙ্গে অবিদ্যার সংস্কারের যুদ্ধ চলছে এবং প্রত্যেকটি নারী মনের গোপনে দ্রষ্টারূপে স্থিত চেতনসত্তা দ্বারা তা অবলোকন করছে। কাজেই দেবাসুর সংগ্রাম সমস্ত নর-নারীর মনোজগতের অন্তর্নিহিত সাধারণ সত্য। এই সংগ্রামে সকলকে অংশ নিতে হবে। আসুরিক শক্তি বিনাশে শুভ সংকল্প গ্রহণ করে চৈতন্যময়ী মাতৃশক্তির সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। মাকে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস নিয়ে ডাকলে, তাঁর শরণাগত হলে, তাঁকে স্তবস্তুতি করলে, তাঁর চরণে নিবেদিত হলে তিনি দ্রুত সাড়া দেন এবং বীর সেনানীর বেশে এসে ভক্ত-সন্তানদের সর্বদাই সহায়তা প্রদান করেন। কাজেই ব্যক্তিগত জীবনে রিপুর উদ্দাম লালসাকে সংযত করে মনের দৈব রূপান্তর ঘটানো, অন্তরে সাত্ত্বিক পরম জ্ঞানের বিকাশ ঘটানোর জন্য আমাদের অহরহ মাতৃশক্তির আহ্বান করতে হবে। তাঁকে সমাদর করে সর্বদা চেতনায় রাখতে হবে এবং শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহযোগে তাঁর অফুরন্ত করুণাশক্তিকে সর্বদা গ্রহণ করতে হবে। তবে রিপুর দুর্দান্ত ক্ষমতা কমবে এবং মন সত্ত্বগুণে পূর্ণ হবে।

।। মাতৃশক্তি, চৈতন্যময়ী মহাশক্তি ও করুণাময়ী মা ।।

এই বিশ্বজগতের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে জগৎমাতার প্রাণ, মন, বুদ্ধি এবং চৈতন্য যাকে সাধারণভাবে আমরা বলি সমষ্টি জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি। এই সমষ্টি জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি যাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তিনিই হলেন চৈতন্যময়ী মা, মাতৃশক্তি—এই মাতৃশক্তিই বিশ্বজগতের সমস্ত বিচিত্র বস্তু, বিষয়, ভাবনায়, অনুভবে ছড়িয়ে আছে। বিশ্বের এমন কোনো স্থান, কাল, পাত্র, বিষয়, কার্যকারণ সম্পর্ক নেই যেখানে চৈতন্যময়ী মায়ের সত্তা বিরাজ করছে না। তাই তো বলা হয়েছে 'যা দেবী সর্বভূতেষু চৈতন্যরূপেণ সংস্থিতা' যে দেবী সর্ববস্তুতে চৈতন্যরূপে বিরাজ করছে তাঁকে প্রণাম করি। এই চৈতন্যবান শক্তি কিন্তু কোনো নিরেট জড়বস্তু নয়, শক্তির অনন্ত মহিমার অন্তরালে রয়েছে এক সার্বজনীন প্রেম ও করুণাশক্তি—যে করুণাশক্তির পরিমাপ করা কখনোই সম্ভব নয়। আমাদের জগতের সমস্ত নারীর প্রেম, করুণা ও দয়াশক্তির সমন্বিত রূপের চেয়েও জগৎমাতার করুণাশক্তি অনন্ত গুণে বেশি। তাঁর করুণা ও প্রেমশক্তির কোনো পরিমাপ করা যায় না। তাঁর অনন্ত মাতৃত্বের চেতনা ভাবলেই মন সমাহিত হয়ে যায়। সোজা কথায় সূর্য যেমন গ্রহগুলিকে আকর্ষণ করে নিজ চারপাশে ঘোরাচ্ছে, ঠিক তেমনি জগৎমাতার প্রেমশক্তি বিশ্বজগৎকে ধারণ করে রেখেছে। তাঁর প্রেম ও করুণাশক্তি সবকিছু ধারণ করে আছে বলেই এত বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও জগৎ টিকে আছে, মহাকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে এবং সবকিছু বিচিত্র বিষয় ও ঘটনাকে একটি সুসমঞ্জস্য উদ্দেশ্যের অভিমুখে পরিচালিত করছে। মোট কথা চৈতন্যময়ী মহাশক্তিময়ী দেবীর স্বরূপে এত করুণাশক্তি নিহিত আছে যার চিন্তা সাধারণ মনুষ্য সন্তানগণের পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল সহজভাবে বলা যায় এই পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্য হৃদয়, নারী হৃদয়, সমস্ত প্রাণী হৃদয়ে যে প্রেমভাব রয়েছে তা তাঁরই প্রেমের সামান্য অংশ মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে এও বলা হয় যে, এখানে যেসব জ্ঞান, সংস্কার, বিশ্বাস, প্রেম ও অনুভব রয়েছে তা সবই হল হিরণ্যগর্ভরূপী মায়েরই বিচিত্র অংশ আর অংশ কখনোই পূর্ণ থেকে পৃথক নয়। তাই যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা কিনা মা-ই সবকিছুর অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্তা রূপে বিরাজ করছেন।

মাতৃশক্তির মহিমা সমন্বিত 'চণ্ডীচিন্তা' করলে যে কোনো মানুষের আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ দ্রুত হতে থাকে। কারণ 'চণ্ডীচিন্তা'

হল মাতৃশক্তির সাক্ষাৎ স্পর্শলাভ। এই মহাশক্তির সঙ্গে মনের সংযুক্তি হলেই সাধনার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মায় এবং নিরন্তর প্রেরণা লাভ করা সম্ভব হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীর দেবীকবচের তাৎপর্য অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, আমাদের স্থূলদেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং দেহের ভিতরের সমস্ত জৈব ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সবই মহাশক্তিময়ী মায়ের অংশবিশেষ—দেহধারী মানুষের নিজ দেহের কোনো অধিকার নেই। মানুষ নিজ দেহ নিজ পরিচালনা করতে পারে না। দূরবর্তী সূর্যের তাপপ্রবাহে বৃক্ষমাতার কৃপায় যে অক্সিজেন তৈরি হয় তাই শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্য দিয়ে দেহ জীবিত থাকে। কাজেই মানবদেহ সতেজ থাকার পেছনে রয়েছে মায়ের পঞ্চভূতরূপী শক্তির বিচিত্র সমাহার। ভাবতে হবে এই মানবদেহটি সাধারণ নয়, এটি একটি বিশ্বজগতের বিবর্তনীয় ইতিহাসের সাক্ষী। তাই মহাবিশ্বে যা আছে সবই মানবদেহ ও মনে স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে। মানবদেহের কুলকুণ্ডলিনী শক্তিতে সমস্ত জ্ঞানরাশি বিদ্যমান। এই জ্ঞানরাশি কিনা সুপ্ত সংস্কারগুলি হল হিরণ্যগর্ভ মায়ের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ—যতই অবচেতন মন পরিষ্কার হয়, শুদ্ধসত্ত্ব হয়, ততই মানবমন সাত্ত্বিক হতে হতে বৃহৎ হয়ে যায়, বিশ্বব্যাপী হয়ে যায় এবং মায়ের অনন্তমনে রূপায়িত হয়ে যায়। আর এই বৃহৎ শুদ্ধ ব্যাপকমনে চৈতন্যরূপী মায়ের দিব্যমুখ সহজেই দর্শন করা সম্ভব হয়। এ কারণেই বলা হয় জ্ঞানদীপ জ্বেলে অন্তরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দর্শন করা সম্ভব হয়। জ্ঞানদীপ কিনা পরমাত্মাগত জ্ঞানের সংস্কার। এই সংস্কার যত বেশি হয় ততই মন নিম্নচেতনা থেকে উচ্চস্তরে গমন করতে থাকে। পরিশেষে সহস্রারে উঠে পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ লাভ করে জগৎমাতার সঙ্গে একাত্ম অনুভব করে।

আমাদের ভাবতে হবে যে, বিশ্বজননীর কর্ম শুধুমাত্র সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করা নয়—জীবকে তাঁর কর্মের ফল প্রদান করাও তাঁর সবচয়ে বড় কাজ। জগতের যেখানে যত জীব রয়েছে তাঁদের সমস্ত কর্মের ফল মা'ই প্রদান করেন। সমস্ত জীবের চেতনা মায়ের অনন্ত চৈতন্যের সঙ্গে সর্বদা নিবিড় সংযুক্ত রয়েছে। কোনো সময়েই বিচ্ছিন্ন হয় না। তাই জীবচৈতন্য যেখানে যা কিছু পাপপুণ্য কাজ করছে তা সর্বদাই মা নজর রাখছেন এবং সেই অনুসারে সমস্ত কর্মফল বিধান করছেন। ভাবতে হবে বাসনা অনুসারেই মা কর্মফল প্রদান করেন। যেমন শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখা যায় রাজা সুরথ রাজ্য ফিরে পেলেন এবং সমাধি বৈশ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলেন। এছাড়া জগতের যেখানে যে কোনো মহান মানব-মানবী, সাধারণ সমস্ত নরনারী, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা সবাই যে যাঁর কর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েই কর্মফল ভোগ করছেন। যেমন সূর্য সমভাবে সকলকে আলো দেয়, ঠিক তেমনি আপন আপন কর্মের ফলে উৎপন্ন সংস্কাররাশিই ফলপ্রদান করে। মা চৈতন্যময়ী এখানে সাক্ষীস্বরূপ দ্রষ্টা হয়ে সবই অবলোকন করছেন। কাজেই সুখ, দুঃখ, লাভ, ক্ষতি, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, জীবন, মৃত্যু এই সবকিছুর মধ্যেই মায়ের অদৃশ্য শক্তি সর্বদাই ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। সোজা কথায় মায়ের আনন্দময় স্বরূপ সত্তার মধ্য থেকেই জন্ম হচ্ছে সৃষ্টি এবং সেখানেই থাকছে স্থিতি এবং আর তার মধ্যেই হয়ে যাচ্ছে লয়। কেবল ত্রিগুণের প্রকারভেদের কারণে অনুভবের জগতের নানা বিচিত্র ভেদাভেদ দেখা যায় এবং প্রকাশও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

।। মাতৃস্বরূপের লীলাকথা ।।

মাকে ভক্তি দ্বারা তুষ্ট করার পূর্বে আমাদের জানতে হবে মায়ের চারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা। মাতৃশক্তি এক ও অখণ্ড সত্তা। মায়ের অনন্ত নাম থাকলেও সেগুলি তাঁর উপাধি মাত্র। মূলত যিনি একটাই মন এবং তাঁর একটাই পরিচয়। আর সেই পরিচয় হল তিনি ব্রহ্মের শক্তি, ত্রিগুণময়ী, আদ্যাজননী, জগৎমাতা, তিনি সৃষ্টি-স্থিতি ও বিনাশ করেন এবং সমস্ত জীবের কর্মফল প্রদান করেন। আবার তিনি বৃহৎ সব কর্ম করতে প্রেরণা প্রদান করেন। তিনি সত্য সনাতনী মহাপ্রকৃতি, সর্বব্যাপিনী এবং ব্রহ্মের আনন্দদায়িনী শক্তি। তাঁর হিরণ্যগর্ভ রূপিণী একই মনের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—

১। **আত্মসমাহিত প্রশান্ত ভাব ও করুণাময়ী** : যখন মা যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া স্বস্বরূপে বিরাজ করেন তখন তিনি পরমাত্মার অনন্ত প্রশান্তির সাথে একাত্মা হয়ে থাকেন। এ সময়ে তাঁর মধ্যে বিরাজ করে বিপুল পরমজ্ঞান, অনন্ত প্রজ্ঞা, অফুরন্ত শান্তি, অপার করুণা, অখণ্ড পবিত্রতা, অসাধারণ মর্যাদা ও মহত্ত্ববোধ এবং কল্পনাতীত নম্রতা, মাধুর্য ও প্রেমভাব যা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে চৈতন্যের সাত্ত্বিক মহিমারূপে সর্বদা প্রকটিত থাকে। এসব হল মায়ের সাত্ত্বিক প্রকৃতির পূর্ণ প্রকাশ। এঁকে আমরা সদা শিবসঙ্গে রতা শিবানী বা মহেশ্বরী বলতে পারি।

২। **বিশ্ববিক্রমী এবং শত্রু দমনে ভয়ঙ্করী** : ভক্ত কল্যাণে, ধর্মরক্ষার্থে, সাধুসন্তান সংরক্ষণে, সৎভাব প্রতিষ্ঠা কল্পে জগৎমাতা অন্তরে সাত্ত্বিকভাব বজায় রেখেই বাইরে রণং দেহি ভয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ করেন। এ সময়ে তাঁকে বলা হয় 'চিত্তে কৃপা সমরে

নিষ্ঠুরতা' অর্থাৎ আসুরিক ভাব অপহরণের জন্য মা বীরবিক্রমে অসুর বিনাশ করেন কিংবা মনোময় শরীরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আসুরিক ভাব ধ্বংস সাধন করে জ্যোতির্ময় স্ব-অঙ্গে মিলিয়ে নেন। এ সময়ে মায়ের মধ্যে অকল্পনীয় বল, অপরিসীম ক্ষমতা ও সাহস, দুর্দমনীয় সংহার শক্তি, বিশ্ববিধ্বংসী ক্রোধ ও রূঢ়তা প্রকট হয়ে ওঠে। মা ক্ষিপ্রগতিতে নানা মায়া রূপ ধারণ করে মায়ারূপধারী অসুর বিনাশে তৎপরা হয়ে ওঠেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করেন। মায়ের এই রূপের নাম হল শ্রীশ্রীচণ্ডিকা এবং করালবদনা কালী প্রভৃতি।

৩। **শান্ত-স্নিগ্ধ মধুর ভাব ও সুসামঞ্জস্য প্রেমময়ী** : মায়ের এই রূপে থাকে অনন্ত অপার সৌন্দর্য, অভূতপূর্ব স্নিগ্ধতা, প্রেম, দয়া, করুণা এবং দিব্য লাবণ্য। শ্রীমূর্তিরূপী মায়ের মধ্যে তখন ফুটে ওঠে অনন্ত আকর্ষণ শক্তি, সুমধুর বাচনভঙ্গি, অপরিসীম প্রেমপ্রবণতা এবং দয়ার অনন্ত মহিমা। মায়ের এই শান্ত-স্নিগ্ধ-করুণাময়ী রূপের নাম হল লক্ষ্মী।

৪। **অনন্ত প্রজ্ঞা ও মেধার পরিপূর্ণতা** : এখানে মা শুদ্ধ সাত্ত্বিক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এ সময়ে তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয় বিপুল আত্মজ্ঞান, সূক্ষ্মতম সুররহস্য, অনন্ত বাচনভঙ্গি, সদা নির্ভুল বিচার, প্রজ্ঞা, মেধা এবং অলৌকিক স্বাধীনতা ও অভাবনীয় মুগ্ধতা। মায়ের এই রূপের নাম হল সরস্বতী।

বস্তুত মায়ের আরো অনেক মহিমাময় রূপ যেমন জগৎধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি থাকলেও এই চারটিই হল প্রধান রূপ। এই চারটি রূপ হিরণ্যগর্ভারূপী মায়ের মনে সর্বদাই সঞ্চিত হয়েছে। যখন যে রূপে আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন তখন সেই রূপেই মা প্রকট হন। তাই ভাবি একই মনে মায়ের কত অনন্ত রহস্যময় সংস্কারগুচ্ছ বিকশিত হয়ে রয়েছে। তাই মা হলেন রহস্যেঘেরা এক অনির্বচনীয় সত্তা যাঁর কিছুটা অংশমাত্র বিশ্বজগতে নেমে এসেছে এবং কর্মপ্রবাহ বজায় রেখেছে। আর অধিকাংশই তুরীয় অবস্থায় কেবল চৈতন্যরূপে সর্বব্যাপ্ত হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে বিজারিত রয়েছে।

বস্তুত সেই বিশ্বব্যাপিনী চৈতন্যময়ী মাতৃশক্তি প্রজ্ঞারূপী শিবের সঙ্গে প্রেমে অভিন্ন অনুভবের ফলেই অসীম আনন্দসম্পন্না হন। শক্তি আধার ছাড়া থাকতে পারে না। শিবরূপী ব্রহ্ম হলেন সেই আধার ও মা হলেন আধেয়—যেমন অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি, জল ও তার তরল শক্তি—অপরদিকে শক্তি ছাড়া শক্তিমান কোনো ক্রিয়া করতে পারেন না। এদিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যায় 'নিতৈব সা জগৎ মূর্তি' রূপে কিনা জগতের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণে মা'ই নানা রূপে, ভাবে, বিষয়ে, বৈচিত্রে বিরাজিতা এবং মহাকারণ রূপে সর্বত্র ব্রহ্ম হয়ে রয়েছেন। 'ব্রহ্ম' হলেন অধিষ্ঠান এবং মা হলেন তার উপর জগৎ রচনাকারী চমৎকার শক্তি—যদিও চরম অনুভবে 'ব্রহ্ম ও শক্তি' এক ও অভিন্ন সত্তা যাঁকে শাস্ত্রে 'মহাকালী' রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মায়ের মহাশক্তিময়ী 'মহাকালী' রূপের মধ্যে সমস্ত ক্ষুদ্র সৃষ্টি, অনুভব ও চেতনার বিলয় ঘটে। সেখানে শক্তিময়ী আত্মস্বরূপিণী মা ব্রহ্মরূপী শিবের সঙ্গে অভেদ ভাবে চিরন্তন এক ও অখণ্ড 'আত্মানন্দে' একাত্মা হয়ে থাকেন। তারপর দীর্ঘকাল কেটে যায় এবং পরে কালের প্রভাবে মায়ের অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তি পূর্ণ সংকল্প গ্রহণ করেন। আর ধীরে ধীরে মহাকাশের বুকে এই বিস্ময়পূর্ণ মহাজগৎ রচিত হয়ে থাকে। একবার সৃষ্টি, কিছুকাল স্থিতি, আবার বিলয়—মায়ের এই অলৌকিক কর্মজগতের কথা চিন্তা করলে সত্যিই বিস্ময়ের ঘোর কাটে না।

।। চণ্ডীতে বর্ণিত মাতৃ-মহিমার কথা ।।

শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থের সর্বত্র মায়ের পূর্ণ মহিমার কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। দেবতা ও ঋষিদের দ্বারা পূর্ণ ভক্তি সহকারে উচ্চারিত চারটি স্তবে দেবী মহিমার কথা প্রকট হয়েছে। এই চারটি স্তব হল 'বিশ্বেশ্বরী স্তব, শক্রাদিকৃত দেবীস্তুতি, অপরাজিতা স্তব ও নারায়ণী স্তুতি'—এই চারটি স্তবে ও অন্যান্য বহু জায়গায় মায়ের রহস্যময় মহিমা সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—সেই তিনিই আবার 'মা' হয়ে সর্বত্র, সব জায়গায় সন্তানের সতত কল্যাণে রত রয়েছেন। তাই ঋষিরা বলে গেছেন, মায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলেই জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ হয়। আর যুক্ততা বা মাতৃভক্তির সঙ্গে ছেদ ঘটলে আসবে অবর্ণনীয় দুঃখ, বেদনা ও যন্ত্রণা। চণ্ডীতে বলা হয়েছে, তিনি বিদ্যাস্বরূপ, পরমা, সনাতনী—তিনি মায়া দ্বারা বন্ধন করেন এবং বিদ্যা দ্বারা বন্ধন মোচন করেন। তিনি প্রসন্ন হলে জীবের বন্ধন মুক্তি ঘটে এবং ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই লাভ হয়। আমরা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত মাতৃভক্তির সারকথাগুলি এবার পরপর লিখছি—

১। দেবী জন্ম ও মৃত্যু রহিতা। এই সমগ্র জগৎই তাঁর মূর্তি। তিনি সমগ্র জগৎ জুড়ে বিরাজ করলেও ভক্তদের ডাকে সাড়া দিয়ে ভগবতীরূপে দেখা দেন।

● চৈতন্যময়ী ভবতারিণী কালিকা।

২। তিনি সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকি জ্ঞানীদেরও মোহগ্রস্ত করে দুঃখে পতিত করেন।

৩। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে প্রভাবিত করেন। এনারাও মায়ের রহস্য সম্বন্ধে অবগত নয়।

৪। মা পুণ্যবান ভক্তদের গৃহে সৌভাগ্য নিয়ে আসেন এবং পাপীদের পাপের শাস্তি প্রদান করেন।

৫। তিনি সৎ ব্যক্তিদের মনে শ্রদ্ধা, মেধা এবং সারস্বত সাধনা রূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

৬। তিনি ত্রিগুণ প্রকৃতি মহামায়া এবং বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি-স্থিতি ও বিনাশ করলেও আসুরিক প্রকৃতির ব্যক্তিরা তাঁর স্বরূপ ধরতে পারে না।

৭। মা ব্রহ্মবিদ্যা রূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং ব্রহ্মবিদ্যার সাধনতত্ত্ব যে যোগ তাও মায়ের কৃপায় লাভ হয়।

৮। তিনিই মেধারূপিণী সরস্বতী। তাঁর কৃপা ও প্রেরণাতেই শাস্ত্রের সারমর্ম জানা যায়।

৯। তিনি ব্রহ্মময়ী এবং পরাবিদ্যা। মায়ের করুণাতেই সাধকেরা সংসার অতিক্রম করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

১০। মা সর্ব অভীষ্টদাত্রী, মা যাদের প্রতি প্রসন্ন হন তাদের ধনসম্পদ, সুখ্যাতি, নাম-যশ বৃদ্ধি পায়। তাদের ধর্ম-কর্ম সদা বজায় থাকে, আয়ু বৃদ্ধি পায়, সুস্থ সুন্দর জীবন বজায় থাকে এবং আত্মীয়-স্বজন সকলেই নিরাপদে থাকে।

১১। মায়ের কৃপায় ভক্তরা অনায়াসেই পুণ্য কর্ম প্রভাবে স্বর্গলাভ করে।

১২। মায়ের ভক্তরা বিপদে পড়ে স্মরণ করলে মা সবকিছু রক্ষা করেন।

১৩। সাধু-মহাত্মা ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা সুসময়ে মায়ের স্মরণ করলে মা শুভবুদ্ধি প্রদান করে এবং আত্মাভিমুখে মনের গতিকে প্রসারিত করেন।

১৪। মা হলেন দৈন্যনাশিনী। মায়ের কৃপায় ভক্তদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের অভাব হয় না।

১৫। মায়ের স্নেহমমতা পেয়ে ভক্ত ভগবৎ জ্ঞান লাভ করেন, ঐশ্বর্য লাভ করেন, সমৃদ্ধি লাভ করেন এবং সংসারের সর্বত্র সুবৃদ্ধি লাভ হয়।

১৬। মা কল্যাণময়ী শক্তিরূপে শুধু নেই—ভক্তমনের যে অপার্থিব সম্পদ যেমন শ্রদ্ধা, ভক্তি, তৃপ্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, কান্তি, ক্ষুধা, নিদ্রা, তৃষ্ণা, লজ্জা, বৃত্তি, দয়া, ভ্রান্তি সবকিছু রূপেই মায়ের ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই বিরাজ করছে। দেবী সর্বভূতেই সদা বিরাজমানা। এমন জ্ঞানেই ভক্তমন সংসারের অবিদ্যা থেকে মুক্তিলাভ করে।

১৭। মা'ই বেদ-বেদান্তের তত্ত্ব ধারণ করার উপযুক্ত বুদ্ধি দান করেন। তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের অভাব হয় না।

১৮। তিনি সর্বশক্তিময়ী, ভবভয়হারিণী এবং সর্ব অভীষ্ট প্রদায়িনী।

১৯। তাঁর কৃপায় ভক্তদের কোনো বিপদ স্থায়ী হয় না এবং ভক্তরা দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সদা ভাল থাকে।

২০। যেসব ভক্তরা মাকে অবলম্বন করে জীবনপাত করেন তাঁরা আবার অপরের আশ্রয়স্থল হন।

২১। ভক্তের হৃদয়ে করুণাময়ী দেবী সদা অবস্থান করেন এবং মনের সমস্ত কামনা ধীরে ধীরে পূরণ করেন।

২২। মায়ের প্রসন্নতা হলে দুর্ভিক্ষ, ঝড়, অনাবৃষ্টি, মহামারী, যুদ্ধ সবই দূর হতে পারে।

২৩। সমস্ত রকম বিপদ-আপদে, অশান্তি, মনোব্যথায়, রোগ-শোকে সবই মায়ের মহিমা সমন্বিত শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ অর্থ বুঝে করলেই দূর হয়।

২৪। মা চণ্ডী স্তব দ্বারা সবচেয়ে বেশি সুপূজিতা হন। তাই নিত্য মায়ের স্তব-স্তুতি পাঠ করলে মা অত্যন্ত আনন্দিত ও প্রসন্ন হন।

২৫। মা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানপ্রদান করে ভক্ত সন্তানকে নিজ চৈতন্যময় ক্রোড়ে তুলে নেন। কাজেই মায়ের অনন্য মহিমা সমন্বিত 'চণ্ডী'র স্তবগুলির অর্থ এবং সামগ্রিকভাবে 'চণ্ডী'র মহিমা নিজ মনে বারংবার স্মরণ-মনন করে মাতৃকৃপা লাভ করতে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

।। মাতৃভক্তি সাধন, নাম গুণগান ও শরণাগতি ।।

এখন আমরা মাতৃভক্তির সাধন তত্ত্বের কথা বলব। এতক্ষণ আমরা মায়ের স্বরূপ, তাঁর অলৌকিক দিব্যরহস্য, ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং তাঁর কৃপাশক্তি তথা কাজকর্মের কথা লিখেছি। ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, দেবীশক্তি জগৎমাতা একটিই— তিনিই পরমাপ্রকৃতি, মহামায়া, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী এবং আরো অসংখ্য নামে অভিহিতা। তাঁর সুন্দর নামটা হল তিনি 'চৈতন্যময়ী শক্তিস্বরূপিণী অনন্ত প্রেম-করুণাসম্পন্না জগৎমাতা' যাঁর কৃপাকটাক্ষে জগতের সবকিছু সৃষ্টি হচ্ছে এবং সৃষ্ট সমস্ত কিছু বিষয়, পদার্থ ও অনুভবের সঙ্গে তাঁর রহস্যময় সংযোগ সারাক্ষণ রয়েছে। তিনি একাই সর্বশক্তির আধার ব্রহ্মময়ী মা এবং সমস্ত অনুভবের আদি সত্তা। বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, প্রহেলিকা, জ্ঞানের মধ্যে তাঁর অনন্ত সত্তা বিরাজমান। তিনি সমস্ত কিছুর অন্তরালে শক্তিরূপে লুকিয়ে থেকে জগৎকে পরিচালনা করছেন। তাঁর চৈতন্যেই সবকিছু চৈতন্যময় হয়ে রয়েছে। আবার তিনিই মহাবিশ্বের সর্ববাপিনী মহাশক্তিরূপে অনন্ত আকাশ তৈরি করেছেন। গ্যালাক্সি, সূর্য, গ্রহ, ধূমকেতু, মেঘ, নীহারিকা, তাপ, জল, মাটি, বৃক্ষ, ফল, ফুল, মানুষজন, মন, প্রাণ, বুদ্ধি, সংস্কার, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, দয়া, ক্ষমা, ভালবাসা সবই তাঁরই দিব্যরূপ—যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা—এই সব কিছু মায়ের চিন্ময়ী অবয়ব। বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টির বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনিই অনুসৃত হয়ে আছেন এবং অসংখ্য সৃজনীশক্তির মধ্যে তাঁর মহিমা প্রকাশিত হচ্ছে। কারণ তিনি শক্তি না দিলে কোনো কিছু হওয়া সম্ভব না। তাই তিনি শক্তিরূপিণী অনন্ত সত্তা। তাঁর কৃপার সংযোগের ফলেই আমাদের ক্ষুদ্র মন ঈশ্বরতত্ত্বের ধারণা করতে পারে এবং ব্রহ্মসাগরে অবগাহন করে পরমানন্দের অধিকারী হতে সক্ষম হয়।

মহাদেবী মা হলেন সগুণ ব্রহ্ম। তাঁর অনেক রূপ থাকলেও ভক্ত একটি মনোমতো রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং মনের সমস্ত প্রেম তাঁকে নিবেদন করেন। আর পরমেশ্বরী ভক্তের প্রেমরজ্জুতে বাঁধা পড়ে দর্শন দেন, কৃপা করেন এবং সন্তানের সমস্ত কাজ নিজে থেকেই সম্পন্ন করেন। যেমন মহা মাতৃভক্ত সাধক শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "মা ভবতারিণী কালীর চরণে আত্মসমর্পণ কর। তাঁর শরণাগত হয়ে থাক। বিশ্বাস কর। নির্ভর কর। তাহলে মা ভবতারিণী কালীই সব তোমার জন্য করবেন।" এই কথাটিই ভক্তদের সর্বান্তকরণে ধারণ করতে হবে। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাতৃসাধনার মূল ভাবই ছিল মায়ের ইচ্ছা ও শক্তির কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা। মা তাঁর কাছে ছিলেন সত্যজননী, জগৎপ্রসবিনী, করুণারূপিণী ও সনাতনী ব্রহ্মময়ী। পরমব্রহ্মের সঙ্গে মায়ের কোনো পার্থক্য তিনি দেখতে পেতেন না। মা তাঁর কাছে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মরূপে, সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থরূপে, জীবজগতের সমস্ত কিছু বিষয়বৈচিত্র রূপে, সাকার রূপে, নিরাকার রূপে— জ্যোতির্ময় দিব্যসত্তা রূপে এবং এঁরও উপরে তুরীয় অনির্বচনীয় পরম তত্ত্ব রূপে বিরাজমানা ছিলেন। মাতৃসাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখ সকলেই মাকে যে এইসব রূপেই দেখছেন তা তাঁদের সংগীতের মর্মবাণীতে ধরা পড়েছে। কাজেই মায়ের অনন্ত মহত্ত্বভাব ও করুণাশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ এবং নিজের আত্মনিবেদনই ছিল তাঁদের সাধনার মূল কথা। এর জন্য তাঁরা মায়ের নাম-গুণগান করতেন, মাতৃলীলা চণ্ডীর আলোকে অনুধ্যান করতেন, মাতৃসংগীত চোখের জল ফেলে গাইতেন, পূজা করতেন, মায়ের নাম-জপ করতেন। মায়ের কাছে প্রার্থনা করতেন। এ সবই ছিল তাঁদের সাধনার অঙ্গবিশেষ। আর এ সবই সকল মাতৃভক্তকে অনুসরণ করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, "সর্বদা মায়ের নাম করতে হয়। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকতে হয়। কাজের সময়েও মনটা তাঁর কাছে ফেলে রাখতে হয়। মন আসক্তিশূন্য হলেই তাঁর দর্শন হয়। তখন শুদ্ধ মনে যা উঠবে সে তাঁরই বাণী। শুদ্ধ মনও যা শুদ্ধ বুদ্ধিও তা—শুদ্ধ আত্মাও তা। কেননা তিনি বই আর কেউ শুদ্ধ নেই।" কাজেই মনের দর্শনের জন্য চাই অন্তঃকরণকে দিনে দিনে শুদ্ধ করা। মনের অশুভ সংস্কার রাশিকে ক্ষয় করা যা উচ্চস্বরে অর্থসহ 'শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থ' পাঠ করলে দিনে দিনে সহজেই সম্পন্ন হতে থাকে। ঠাকুর আরো বলতেন, যদি "মায়ের প্রতি রাগভক্তি কারো হয়—অনুরাগের সঙ্গে তীব্র ভক্তি—তাহলে তিনি স্থির থাকতে পারেন না, দর্শন দেন।" এসব অমৃত কথায় বস্তুত শ্রদ্ধাবিশ্বাস করতে হবে। এই শ্রদ্ধাবিশ্বাসই হচ্ছে ধর্মজগতের চালিকা শক্তি। শ্রদ্ধাবিশ্বাস ও ভক্তিতেই হয় যথার্থ মাতৃ আরাধনা। যত মায়ের করুণা ও প্রেমশক্তিতে শ্রদ্ধাবিশ্বাস হবে ততই মন শুদ্ধ হবে, মায়ের প্রতি শরণাগতের ভাবের বৃদ্ধি ঘটবে এবং শেষে আত্মসমর্পণ। মা মহামায়া এসবই সন্তানদের কাছ থেকে চান— তিনি ভক্তি ভক্ষণ করেন। তিনি চান শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা, বিনম্রতা, নিরহংকারিতা প্রভৃতি দৈবীগুণ। বস্তুত মায়ের রূপ, নাম, লীলা, শক্তি, করুণা, মহত্ত্বের প্রতি যত

শ্রদ্ধাবিশ্বাস হবে ততই ধীরে ধীরে অন্তঃকরণ শুদ্ধ পবিত্র হতে থাকবে, ক্ষুদ্র মন বৃহৎ হিরণ্যগর্ভ হয়ে যাবে, বোধশক্তি তীব্র থেকে তীব্রতর হবে এবং শেষে বুদ্ধি মহৎতত্ত্বে রূপান্তরিত হবে এবং সর্বব্যাপী আত্মস্বরূপিণী মায়ের মধ্যে অবগাহন করবে। তাই ভক্তদের শ্রদ্ধাবিশ্বাস নিয়ে মায়ের চরণে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাস, চিন্তা, কর্ম ও তার ফল মায়ের চরণে নিবেদন করতে হবে। ভাবতে হবে যে, আমাদের বেঁচে থাকা, শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া, চিন্তা করা, অনুভব করা, উপলব্ধি করা সবই মাতৃশক্তির ফলেই সম্ভব হচ্ছে। মায়ের শক্তিকৃপা না থাকলে কিছুই হত না। এমনভাবেই দীনহীন হয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে দিনে দিনে মাতৃভক্তির সাধনা বৃদ্ধি করতে হবে। তাহলে একদিন দেখবে যে, জগৎমাতা তোমার সমগ্র সত্তার মধ্যে পূর্ব থেকেই বিরাজিতা। তিনিই তোমার দেহ, মন, প্রাণ, চিন্তা, চেতনা সবকিছুই হয়েছেন এবং তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই তিনি তোমাকে তাঁর মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। তোমাকে ভালবাসার জন্য, করুণা করার জন্য একটু দূরে দূরে রেখেছেন—যাতে তুমি 'মা' 'মা' 'মা' বলে ডেকে তাঁকে আনন্দ দিতে পার, তাঁর কাছে প্রেমভরে, নির্ভর করে এগিয়ে যেতে পার। ক্রমশ দেখবে তুমি তাঁর ভেতরেই নিরাপদে বাস করছে। তিনি তোমাকে সবদিক দিয়ে রক্ষা করছেন, শুভ চেতনা দান করছেন, তোমাকে ধীরে ধীরে তাঁর শুদ্ধ আনন্দময় কোলে তুলে নিচ্ছেন। অতঃপর তোমার উপলব্ধিতে ধরা পড়বে যে, তুমি তাঁরই অংশস্বরূপ, তাঁর চৈতন্যেই তোমার চেতনা, তাঁর মনই তোমার মন, তাঁর বুদ্ধিতেই তোমার বিচারধারা, তাঁর অনুভবেই তোমার অনুভব—যে অনুভবে মা ও সন্তানের এক চিরন্তন আত্মিক একত্ববোধ প্রস্ফুটিত হচ্ছে।

ভাবতে হবে মায়ের সঙ্গে মূল সম্পর্ক স্থাপন করা যায় প্রেমের মাধ্যমে। মাকে মনে-প্রাণে ভালবাসতে হবে। মায়ের 'চণ্ডীমূর্তি'কে ভালবাসতে হবে, কালীমূর্তিকে ভালবাসতে হবে—তিনি মা বরদায়িনী, অভয়দায়িনী, সন্তানবৎসলা। সদা রক্ষাকর্ত্রী এবং সর্বোচ্চ সদ্‌গুরু। তাঁর অধীনে থাকলেই সর্বতো মঙ্গল। কারণ তিনি মঙ্গলময়ী। মাকে পাওয়ার কিনা তাঁর কৃপাকরুণা পাওয়ার জন্য ব্রহ্মাকেও তপস্যা ও স্তব করতে হয়েছিল। স্বয়ং নারায়ণ প্রথম মাতৃপূজা করেন। আর দেবাদিদেব শিব তো মা ছাড়া কিছুই জানেন না। অবতারপুরুষ রামচন্দ্র মা দুর্গা ও ভদ্রকালীর পূজা, স্তব করেছিলেন। অর্জুন মাতৃ স্তব-স্তুতি করে গেছেন। এ যুগের মহাসাধক রামকৃষ্ণদেব সোজা নরেন্দ্রনাথকে বললেন, "তুই মাকে মানিস না, তাই তোর এত কষ্ট—যা আজ মঙ্গলবার, কালীঘরে যা—মায়ের কাছে চেয়ে নে।" বুদ্ধিমান নরেন জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য চাইলেন এবং তা পেলেন। আর তাঁর প্রভাবেই তিনি বিশ্ববিজয়ী মহান সন্ন্যাসী তথা আচার্যরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। এভাবে দেখা যায় যে, যে কোনো মহান পুরুষের জীবনে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে জগৎমাতার কৃপা বর্ষিত হয়েছে এবং তাঁর প্রভাবেই তিনি নিজ নিজ ক্ষেত্রে বৃহৎ হয়েছেন।

মোট কথা আদ্যাশক্তির মহিমা সব নারীর অন্তরে গ্রথিত হয়ে রয়েছে। নারীকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান প্রদান করলেই এই মহাশক্তি পুরুষদের অন্তরে জাগ্রত হয়ে ওঠে। চণ্ডীতে দেখা যায়, চণ্ড-মুণ্ড-শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুররা মাকে জোরপূর্বক ভোগ করতে এগিয়ে গিয়েছিল। আর তার পরিণতি হল পুরোপুরি ধ্বংস। অপরদিকে দেবতা-ঋষিরা মায়ের স্তব-স্তুতি করে সবকিছু ফিরে পেলেন। তাঁদের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও আনন্দ সবই এল। তাই ভোগ নয়, ত্যাগের মধ্যেমে, সেবার মাধ্যমে, স্তব-স্তুতির মধ্য দিয়ে শক্তিকে প্রসন্ন করতে হবে। তবেই তাঁর কৃপাতে জীবন পুণ্যতায় ভরে যাবে। তাই চণ্ডীর আলোকে দেবীভাবনার মূল কথা হল নারীতে দেবীভাবনার সাধনা। নারীতে মাতৃ-ভাবনার সাধনা করা। আদ্যাশক্তি নারীমূর্তিতেই প্রকটিত হয়েছেন। প্রত্যেক নারীর অন্তরনিহিত চেতনাই হল আদ্যাশক্তির চেতনা—এঁকে শ্রদ্ধাভক্তি, সমাদর করতে পারলেই হবে অজ্ঞান থেকে মুক্তি তথা মাতৃলাভ। মোটকথা 'চণ্ডীপাঠের' মহিমার সঙ্গে মা ভবতারিণী কালী তথা দক্ষিণা কালিকার পূজা করলে ভক্ত সন্তানরা সমস্ত কিছুই লাভ করেন। তাঁদের ধর্ম, অর্থ, আয়ু, ঐশ্বর্য, আরোগ্য, সুস্বাস্থ্য, মানসিক ও দৈহিক শক্তি, যশ, খ্যাতি, তৃপ্তি, শান্তি, আনন্দ, কবিত্বশক্তি, লেখনীশক্তি, সংগীত, বিপুল কীর্তি স্থাপন, ভোগ ও মোক্ষলাভ সহজেই প্রাপ্ত হয়। 'কালীতন্ত্রে' আরো লেখা আছে যে, "যিনি জাগরণে, নিদ্রায়, উপবেশনে, গমনকালে, আহারে ও আলাপচারিতার সময় সতত দেবীর স্মরণ করেন, দেবী তাঁর সঙ্গেই সর্বদা বিচরণ করেন এবং সেই ব্যক্তি সহজেই সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শিবলোক প্রাপ্ত করেন।" তাই বলা হয় কালী সমান বিদ্যা নেই, কালী সমান ধর্ম নেই, কালীভজনা ছাড়া কর্ম নেই, তপস্যা নেই তাই মনে-প্রাণে মায়ের কালী রূপের সাধন-ভজন করুন। মাতৃভক্তি সাধনা করুন। জয় কালী। জয় মা ভবতারিণীর জয়।